শুকতারা

পঞ্চবিংশবর্ষ, একাদশসংখ্যা, পৌষ, ১৩৭৯

পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে বড় যুধিষ্ঠির। ইনি খুবই ধর্মপ্রাণ, সত্যবাদী এবং ঠাণ্ডা মাথার মানুষ।

ইনি দুর্যোধন,—কৌরবদের মধ্যে প্রধান। সাহস, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, সবই ছিল। কিন্তু দুর্যোধন দুরাচারী।

ইনি কর্ণ। পাণ্ডবদেরই ভাই, কিন্তু দুর্যোধনের বন্ধু। অসাধারণ বীর। দানেও অতুলনীয়।

ইনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। তাঁর বন্ধু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। সুদর্শন, সুপণ্ডিত,—মহাবীর।

ইনি ভীম। বলে পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতি সরল প্রকৃতির মানুষ। স্পষ্ট বক্তা।

অমৃত সমান মহাভারত-কথা

বোরোলীন হাউস কর্তৃক প্রচারিত

নকুল চতুর্থ পাণ্ডব। দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। শান্ত প্রকৃতির মানুষ কথা বলতেন কম। কিন্তু সাহস ছিল।

সহদেব, নকুলের যমজ ভাই। শক্তিমান, শাস্ত্রে পণ্ডিত। অপমান বোধ খুবই তীব্র ছিল তাঁর।

বোরোলীন
সুরভিত
অ্যাণ্টিসেপটিক ক্রীম
কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, রুক্ষ-শুষ্ক,
কিংবা ঝলসানো ত্বকের
অনবদ্য নিরাময়—।

(চলবে)

বাঁটুল দি গ্রেট

স্টক থেকে হাতিয়ার নিয়ে চল, বাঁটলোর ওপর হামলা করতে হবে!
ও ওর ঘরে একাই কি নাটকের যেন রিহার্সাল দিচ্ছে মনে হল।
এখান থেকেই হাতিয়ার ছুঁড়ে দে!
ইয়ুঃ!
এই যে মানিকজোড়! তোমাদের খবর আমি আগেই পেয়ে গেছি!
বাঃ!
লোহার বর্ম
কিছু মনে কোরোনা বাঁটুলদা! তোমার সঙ্গে আমরা একটু মস্করা করলুম!
তাই বুঝি!
হিঃ-হিঃ! বাঁটলোর টুলের নীচে এই ডিনামাইটটা কিন্তু মস্করা নয়!
এঃ!
দুড়ুম!
বাঁটুল এবারে কাবার! বাঁটুল এবারে কাবার!
বাঁটুল ফিরেছে আবার!
ধড়াম!
পরে
ইলেকট্রিসিয়ান
এবারে বাঁটলোকে ঠিক কব্জা করে ফেলবো!

তাজ্জব!
আমি শূণ্যমার্গে বিচরণ করছি মনে হচ্ছে!
এবারে বাঁটলোকে ধরেছি! ওর লোহার বর্মই ওকে ধরতে সাহায্য করেছে! কাছিটা রেডি রাখ!
হোঃ-হোঃ! রাস্তাটা ঢালু হয়ে নদীতে গিয়ে পড়েছে!
বাঁটলোও সেখানেই গড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে!
গেছিরে!
হতভাগারা ঝামেলা করে আমার রিহার্সাল নষ্ট করে দিলো! শয়তান দুটোকে একবার হাতে পেলে হয়!
বেচারা বলীবর্দ! সংঘর্ষটা এড়ানো গেল না!
ধমাস!
বাবাগো! ক্ষ্যাপা ষাঁড়!
ষাঁড়ের হাত থেকে তুমি আমায় বাঁচিয়েছো!
আরে! আপনার দোকান থেকেই না বিচ্ছু দুটো মস্ত একটা চুম্বক কিনেছিলো? এবার ওদের শায়েস্তা করতে আমায় সাহায্য করুন!
হিঃ হিঃ! এবার শত পেটালেও আমাদের আর লাগবে না! আমরাও লোহার বর্ম পরেছি!
বুদ্ধি বাৎলানোর জন্যে ধন্যবাদ! বিদ্যুৎবাবু!
ওরে বাবারে! বাঁটলো এবারে ইলেকট্রিক্যাল বেত দিয়ে ঠ্যাঙাচ্ছে রে মাইরি!

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321 (9)-T. B. C.
(Dated 14th August, 1971. 2B-20G/71)

সূচীপত্র—পৌষ, ১৩৭৯

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	মরণের ডাক	তুষার চ্যাটার্জী	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট	নারায়ণ দেবনাথ	প্রথম ছবি
৩।	বাঘহীন দেশ (কবিতা)	শ্রীজয়দেব ভট্টাচার্য	৭৬৭
৪।	বরফের দেশ (জানবার কথা)	—	৭৬৮
৫।	ছত্রপতি শিবাজী (অমর বীর কাহিনী)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার	৭৬৯
৬।	আশ্চর্য (সত্য ঘটনা)	শৈলেশ ভড়	৭৭৮
৭।	উল্কার ক্ষতির হিসাব (জানবার কথা)	—	৭৮২
৮।	সেকালের গল্প (গল্প)	সুজাতা সেনগুপ্ত	৭৮৩
৯।	বিনা পয়সার ভোজ (মজার কথা)	—	৭৮৬
১০।	সমাধান (বিদেশী গল্প)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	৭৮৭
১১।	সাবান হল কবে ঃ শিক্ষাকে শ্রদ্ধা (জানবার কথা)	—	৭৯৪
১২।	রোমন্থন (গল্প)	শ্রীআশীষকুমার দাশ	৭৯৫
১৩।	সাঁতার কাটা কল (জানবার কথা)	—	৭৯৭
১৪।	বোকা হীরু (ছবিতে গল্প)	মৈত্রেয়ী মুখার্জী	৭৯৮
১৫।	কালচক্রের সওয়ার (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ)	শ্রীবৈজ্ঞানিক	৮০২
১৬।	"৺বাসুদেব ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"	—	৮১৪
১৭।	আগন্তুক (ছবিতে গল্প)	মন্মথ চৌধুরী	৮১৫
১৮।	বিষুব রেখার অন্তরালে (ধারাবাহিক কাহিনী)	শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু	৮১৬
১৯।	হাঁদা-ভোঁদার লুকোচুরি (ছবিতে গল্প)	—	৮২৪
২০।	বাঙালী ভোজনবীর (গল্প)	অম্বুজেন্দ্র ঘোষ	৮২৬
২১।	একটি মজার গল্প (গল্প)	সোনা মুখার্জী	৮২৮
২২।	সহজ উপায় (মজার কথা)	সুতপা মিত্র	৮৩০
২৩।	চেষ্টার ফল (জীবনকথা)	পূরবী দেবী	৮৩১
২৪।	কেউ ভোলে না কেউ ভোলে (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	তপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ	৮৩৩
২৫।	নীচু নজর ঃ নাইনটি পারসেন্ট (মজার কথা)	রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৮৩৫
২৬।	ঊনশ আট বাহাত্তর (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	সুভাষ বৈদ্য	৮৩৬
২৭।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)	—	৮৩৯

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ৮০ পয়সা

everest/122b/PP ben

শুকতারা

পঞ্চবিংশ বর্ষ ঃ ১০ম সংখ্যা
১৩৭৯, পৌষ

বাঘহীন দেশ

শ্রীজয়দেব ভট্টাচার্য

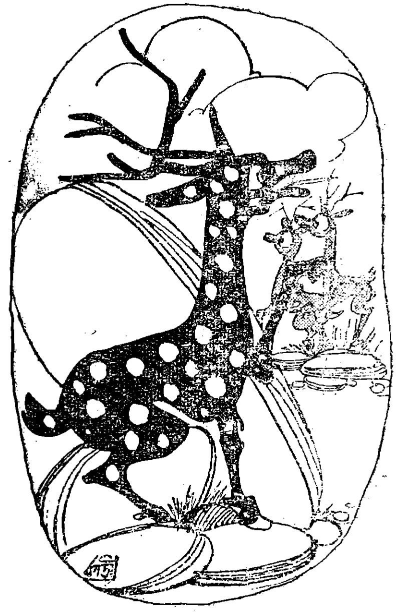

রব তুলেছে বনের হরিণ—"জবাব মোদের চাই—
সিংহ রাজার রাজ্যে কেন বাঁচার সুযোগ নাই !
'বাঘগুলো সব নির্বিচারে মোট্‌কে মোদের ঘাড়
পেটটি ভরে মাংস খাবে' এই কি আইন তাঁর ?"
তাই না শুনে সিংহ রাজা বলেন—
"এ তো সত্যি।
মোর রাজ্যে থাকবে কেন অন্যায় এক রত্তি ?
'দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন' এই তো রাজার কাজ।
এই আইনেই সবার বিচার করব আমি আজ।"
হরিণরা সব বলল তখন—"বিচার-টিচার নয়,
সেই রাজ্যেই পাঠান মোদের ভয় যেথা না রয়।
নিশ্চিন্তে সবাই যেন থাকতে পারি বেশ !

বাঘ আসে না যেথায় এমন নেই কি
কোন দেশ ?
একটু ভেবে সিংহ রাজা বলেন—
"হ্যাঁ, তা আছে।
দেখতে হলে সে দেশ, এসো আমার
গুহার কাছে।"
এমন মধুর জবাব শুনে মুগ্ধ হরিণ প্রজা
এক সাথে সব পৌঁছোলো যেই
গুহার কাছে সোজা,
"একটু দাঁড়াও", মুচকি হেসে বলেন পশুরাজ—
"বাঘহীন দেশ আমার পেটেই দেখবে
সবাই আজ॥"

বরফের দেশ

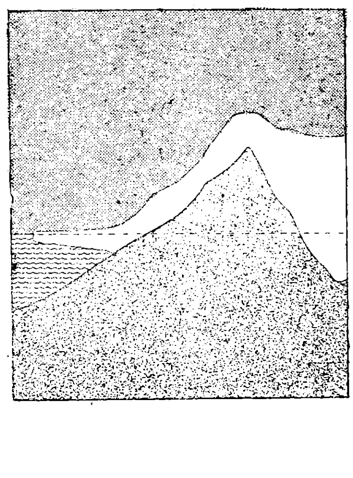

পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে উঁচু মহাদেশ হল আনটার-টিকা, পৃথিবীর দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত। মহাদেশটি তুষার আর বরফে আবৃত। গড়পড়তায় এই দেশটি সমুদ্র-কিনারা থেকে এক মাইল উঁচু। এই দেশের সর্বোত্তম উচ্চ শিখর হল ভিনসন ম্যাসিফ। এর তলদেশ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে কোথাও কোথাও তলদেশ এক হাজার ফুট অবধি জলের তলায় নেমে গেছে আর সেখানে বরফের চাঁই ১০,০০০ ফুট মোটা হয়ে লেগে আছে।

ছত্রপতি শিবাজী

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

আহম্মদনগরের সুলতানী ফৌজে ছিলেন সামান্য পদাতিক, কর্মশক্তির গুণে তিনি উঠে গেলেন প্রশাসনের শীর্ষদেশে। সেই পুরুষসিংহ সাহসী ভোঁসলেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। পুণায় পিতার জায়গিরে মাতা জীজাবাইয়ের কোলে মানুষ শিবাজী। শিক্ষক দাদাজী কহ্নদেব (কোণ্ডদেব) তেমনি যত্নে শিখিয়ে যাচ্ছেন সমাজ ও ধর্মনীতির সঙ্গে মিশিয়ে মধ্যযুগীয় রণনীতিও, যেমন করে দ্বাপর যুগে অর্জুনকে শিখিয়েছিলেন সর্বদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আচার্য গুরু দ্রোণ।

কিশোর শিবাজীর কানে আসে একনাথ, তুকারাম, রামদাস ও বামন পণ্ডিতের উদাত্ত বাণী—"ভেদ নাই, ওরে ভেদ নাই। এক ভগবানেরই সন্তান সব মানুষ। উচ্চ নীচে অসমজ্ঞান হল মহাপাপ। পূজার অর্ঘ্য সেই একজনেরই প্রাপ্য, তাঁরই চরণে ঢেলে দাও হৃদয়ের সমগ্র ভক্তি নিঃশেষে উজাড় করে।"

এক অদ্ভুত সমন্বয় ঘটে শিবাজী চরিত্রে। জীজাবাইয়ের মুখে নিখিল মহামানবের জীবনী কীর্তন, দাদাজীর মুখে ব্যবহারিক সর্বশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আর রামদাসের মুখে আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের প্রশস্তিগান, এই ত্রিধারায় নিত্য স্নান করে করে শিবাজীর অন্তরপদ্ম দিনে দিনে বিকশিত হয়ে ওঠে সহস্রদলে সুষমা বিস্তার করে।

মাওয়ালী তরুণেরা ভিড় করে আসে তাঁর চারিধারে। তাদের নিয়ে কিশোর শিবাজী গড়ে তোলেন মুক্তি সেনাদল। এই পুণ্যভূমি মহারাষ্ট্র, উত্তরে বিন্ধ্য সাতপুরার উন্নত প্রাকার আর নর্মদা তাপ্তির গভীর পরিখা যাকে করে রেখেছে বহিরাগতের দুরধিগম্য, দুর্গম সহ্যাদ্রি

যার পশ্চিম সীমাকে সুরক্ষিত করে রেখেছে ইওরোপীয় জলদস্যু ও বণিক-দস্যুর লোলুপ দৃষ্টি থেকে, সে কেন পারে না নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে ?

কেন ? কেন হল বাহমনিদের উদ্ভব ? কেন রাষ্ট্রকূট চোল চালুক্য পহ্লবের পতন হল একে একে ? বিজয়নগর কেন হল বিধ্বস্ত ? শৌর্যবীর্যের অভাব আছে হিন্দুর, এমন কথা ইতিহাস বলে না। আছে অভাব শুধু একটি বস্তুর। সে হল ঐক্যবোধ। পরস্পরে হানাহানি করে যে শক্তির অপচয় করেছে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু, তা সংহত, একধারায় প্রবাহিত হলে তার বেগ হত অপ্রতিরোধ্য। ইতিহাসের এ-শিক্ষা মর্মে মর্মে সঞ্চারিত হল শিবাজীর মনে। সহচর মাওয়ালীদের কানে সেই ঐক্যমন্ত্রই দান করলেন মহারাষ্ট্রের নবীন রণগুরু।

যৌবনের প্রথম আগমনী ধ্বনিত হল রণবাদ্যের তালে তালে। সহ্যাদ্রির চূড়ায় চূড়ায় দুর্ভেদ্য সব দুর্গ। একটার পরে একটা অধিকার করে নিচ্ছেন পুণার শিবাজী। দুর্গাধিপতির পুরুষানুক্রমে প্রায়-স্বাধীন। নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করেন কোন পরাক্রান্ত রাজার আগের দিনে করতেন হিন্দু সম্রাট্‌দের, যাঁদের অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটে বেরুতো বাতাপি দ্বারসমুদ্র মান্যক্ষেত্র বা কাঞ্চী থেকে। আজ তাঁদের আনুগত্য লাভে ধন্য হয়েছেন বিজাপুর আহমদনগরের সুলতানেরা। রাষ্ট্রবিপ্লবের আগুন কোন যুগেই এঁদের স্পর্শ করে নি গিরিচূড়ায় এক একটি দুর্গ যুগ যুগ ধরে আধিপত্য করে যাচ্ছে গিরিপাদদেশের এক একটি নিভৃত রুক্ষ উপত্যকার উপরে।

সেই দুর্গগুলি এইবার বিপদে পড়েছে। একটার পরে একটা কুক্ষিগত হচ্ছে এক বালকের। যার পিতা আগে চাকরি করতেন আহম্মদনগরে, এখন করেন বিজাপুরে। সে-বালকের দম্ভের সীমা নেই। আত্মপ্রচার করে রাজবংশীয় বলে, অথচ সাহচর্য তার মাওয়ালী কৃষকদের সঙ্গে। রাজবংশীয় ? হ্যাঁ, মাতৃকুল নাকি তার দেবগিরির যাদব, পিতৃকুল মেবারের শিশোদিয়া। দুটিই মহামহিম রাজবংশ।

দুর্গাধিপতিরা সম্পদের দিনে অল্পই সংস্রব রাখেন অধিরাজের সঙ্গে। এখন অস্তিত্বই ঘুচে যাওয়ার দাখিল হয়েছে দেখে স্মরণ করলেন যে শিবাজীর আগ্রাসী বাহুর আক্রমণ থেকে তাঁদের রক্ষা করার দায়িত্ব অধিরাজদের। আহম্মদনগর এখন বিলুপ্ত, তার অধিকৃত অঞ্চল যেটা ছিল, তার অর্ধেকে এখন প্রভুত্ব করেন দিল্লীর মুঘল বাদশা, বাকী অর্ধেকে বিজাপুরের সুলতান। আহম্মদনগর নেই, কিন্তু বিজাপুর আছে, আছে দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্য। "বাঁচাও, বাঁচাও" আর্তনাদে যুগপৎ চমকে উঠলেন দিল্লীর বাদশাহ এবং বিজাপুরের সুলতান।

দিল্লীর একটু দেরি হয় নড়তে চড়তে। কারণ তার মনোযোগ প্রায় সর্বদাই অখণ্ডভাবে জুড়ে বসে থাকে উত্তরাপথের শতেক দুশমন—আফগান, শিখ, জাঠ, রাজপুত। "দেখছি, দাঁড়াও, ধৈর্যং রহু" ইত্যাদি বাণী পাঠিয়ে দিয়ে দিল্লী দরবার প্রথম কিস্তির

একটার পরে একটা দুর্গ অধিকার করে নিচ্ছেন পুণার শিবাজী। [পৃষ্ঠা ৭৭০

কর্তব্য সমাপন করলেন। বিজাপুর প্রথম দফায় যে-সাজা দিলেন শিবাজীকে, ব্যক্তিগত-ভাবে তা শিবাজীকে মর্মান্তিক পীড়া দিলেও তাতে তাঁর আগ্রাসননীতি ব্যাহত হল না কোনমতে।

সাজাটা হল এই। শিবাজীর পিতা শাহজী তখনও বিজাপুর সরকারে উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত, তাঁকে কারারুদ্ধ করলেন সুলতান। তাঁকে বলে দেওয়া হল—পুত্রের কুকর্মের জন্য পিতার দায়িত্ব না থেকে পারে কেমন করে? শিবাজীকে সংযত করতে না পারলে শাহজী সারা জীবনেও মুক্তি পাবেন না।

শাহজী এ-অন্যায়ের জবাব দিলেন মুখের মত—"প্রথমতঃ আমি বলতে চাই, শিবাজীর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ নাই অন্ততঃ দশ বৎসর। তার কোন কাজই আমার অনুমোদন সাপেক্ষ নয়, আমি নিষেধ করে পাঠালেই সে যে আরব্ধ কাজ থেকে নিবৃত্ত হবে, এমন অনুমান করবার কারণ কিছু নেই। দ্বিতীয়তঃ আমার বক্তব্য হল এই যে নিজের শক্তিবৃদ্ধিকল্পে সে যা-কিছু করছে, তাতে আমার অনুমোদনই আছে ষোল আনা। সে যদি আমার একান্ত বাধ্যও হত, তবু আমি তাকে তা থেকে নিবৃত্ত হতে বলতাম না।"

সুলতান ভয়ানক রেগে গেলেন স্বভাবতঃই। শাহজীর কারাজীবনকে আরও কষ্টকর করে তোলা যায় কী কী উপায়ে, তাই ভাবতে বসলেন পাত্রমিত্রসহ, এবং দরবারের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত আমীর আফজল খাঁর উপরে ভার দিলেন শিবাজী-দমনের।

আফজল খাঁ সুদক্ষ সেনানায়ক, কিন্তু আমীরসুলভ আয়েসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। ঋতুটা বর্ষা, এটা শেষ হলেই তিনি রণযাত্রা করবেন। আশ্বাস দিলেন সুলতানকে, ততদিন তোড়জোড় হোক অভিযানের।

এদিকে শিবাজী নিশ্চেষ্ট নেই। তিনি এক আরজি পাঠালেন দিল্লীর বাদশাহের কাছে —"জাঁহাপনা, আমি ক্ষুদ্র জায়গিরদার। পূর্বে আহম্মদনগরের স্থলতান এই জায়গির দেন আমার পিতাকে। এখন আহম্মদনগর বাদশাহের অধিকৃত এলাকা, সুতরাং আমিও নিজেকে বাদশাহেরই প্রজা বলে মনে করি। বিজাপুর যে-সব দুর্গকে নিজের বলে দাবি করছে, সেগুলি তাঁর কোন কালেই নয়। ওগুলিও পূর্বে ছিল আহম্মদনগরের, এখন কাজে কাজেই ওদের মালিকানার দাবি একমাত্র বাদশাহই করতে পারেন। আমি যে-কয়টি দুর্গ দখল করেছি, তা বাদশাহের পক্ষ থেকেই করেছি, সুযোগমত দিল্লী গিয়ে বাদশাহকেই নজরানা স্বরূপ সে-সবের অধিকার সমর্পণ করার বাসনা আমার। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখুন, বিজাপুর স্থলতান অন্যায় লোভের বশবর্তী হয়ে আমার পিতাকে কারারুদ্ধ করেছেন, দুর্গগুলি যাতে বাদশাহের চরণে উপঢৌকন না দিয়ে তাঁকেই দিয়ে দিই, এই উদ্দেশে আমার উপর চাপ সৃষ্টি করবার জন্য। এমত অবস্থায় বাদশাহের নিকট বান্দার মিনতি বিজাপুর স্থলতান যাতে আমার নিরপরাধ পিতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন, এমন আদেশ স্থলতানের উপর জারি করতে আজ্ঞা হয়।"

দিল্লী দরবার চমৎকৃত! আহম্মদনগরের কোন দুর্গ বেদখল অবস্থায় ছিল, এমন তথ্য দরবারের কাগজপত্রে নেই। যা হোক, এই শিবাজী লোকটা সে-সব নিজের চেষ্টায় দখল করে যখন খামোকাই বাদশাহকে দিয়ে দিতে চাইছে, সে আর মন্দ কথা কী! বিজাপুরকে একটা কড়া চিঠি দিলেই—

বস্তুতঃ একটা কড়া চিঠি আসতেই বিজাপুর স্থলতান মুক্তি দিয়ে দিলেন শাহজীকে। শাহজী ইতিমধ্যে অন্য একটা জায়গির পেয়েছেন ঐ বিজাপুরেরই কাছ থেকে। সেটা সুদূর কর্ণাটে। শাহজী সেইখানে চলে গেলেন বিজাপুর ত্যাগ করে। স্থলতানের চাকরিতে আর তাঁর বহাল থাকা চলে না। থাকলে পদে পদে তিনি বিব্রত করবেন শিবাজীকেই।

পিতার মুক্তির ব্যবস্থা করেই জাবলি আক্রমণ করলেন শিবাজী। এটি একটি অনতি-বৃহৎ মারাঠা রাজ্য। নামে বিজাপুরের অধীন হলেও কার্যতঃ স্বাধীন। জাবলিপতি চন্দ্ররাও নিহত হলেন যুদ্ধে। জাবলি অধিকার করে বসলেন শিবাজী।

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। বিজাপুর স্থলতান কড়া হুকুম দিলেন আফজল খাঁকে— "এক্ষুণি যুদ্ধযাত্রা কর খাঁ সাহেব! বর্ষার ভয় করলে রাজ্যরক্ষা করা যায় না। জীবিত বা মৃত শিবাজীকে এনে দাও আমার কাছে।"

আফজল খাঁ অভিযান শুরু করেই তুলজাপুরে ধ্বংস করলেন ভবানী মন্দির। বীরত্ব প্রকাশ করলেন নিরীহ পূজারীদের হত্যা করে, এবং দেবীর শিলামূর্তি বিচূর্ণ করে। ধর্মপ্রাণ

মারাঠাজাতি একবাক্যে গর্জে উঠল—"এ-অনাচারের প্রতিশোধ আমরা নেবই।" শিবাজীও প্রতিজ্ঞা করলেন—"নেবই প্রতিশোধ।"

আফজল খাঁ শিবির স্থাপন করেছেন ওয়াই-উপত্যকায়, শিবাজীর প্রতাপগড় দুর্গের অনতিদূরে। শিবিরে বসে খুবই ভাবছেন আফজল।

বিজাপুর সুলতান চেয়েছেন, জীবিত বা মৃত শিবাজীকে এনে দিতে হবে তাঁর কাছে। আফজল খাঁ ভেবে দেখছেন—জীবিত শিবাজীকে নিয়ে যেতে হলে প্রথমে তাকে পরাজিত ও বন্দী করা দরকার। অত্যন্ত ঝামেলার ব্যাপার। এই পাহাড়ের দেশ, পাহাড়ের প্রতি চূড়ায় একটা করে দুর্গ। এখানে মুষ্টিমেয় মাওয়ালীও একটা সুশিক্ষিত সেনাদলকে আটক করে রাখতে পারে বহু বৎসর। ও ঝামেলায় দরকার নেই। মৃত শিবাজীকে পেলেও যখন চলে সুলতানের, তখন ওকে ডেকে এনে মেরে ফেলাই সুবিধাজনক।

কৃষ্ণাজী ভাস্কর বিজাপুরী পলটনের রসদ জোগানদার। তাঁকে দূতস্বরূপ শিবাজীর কাছে পাঠালেন আফজল খাঁ। কৃষ্ণাজী গিয়ে বলবেন—বিজাপুরী সেনাপতি সাক্ষাৎ চান শিবাজীর। মুখোমুখি আলাপ করে একটা মিটমাটের চেষ্টা করলে ক্ষতি কী! দেখা করলে শিবাজীর কোন অনিষ্ট হবে না, স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হল কৃষ্ণাজী মারফত।

দৌত্য নিয়ে কৃষ্ণাজী যখন এলেন, শিবাজী কিছুক্ষণ চিন্তা করে তাঁকে বললেন—"ভদ্র কৃষ্ণাজী, আপনি নিজে মারাঠা। শিবাজী নামক এক মারাঠা যুবক মারাঠা জাতিরই শক্তি-বৃদ্ধির জন্য এই যে চেষ্টা করছে, এতে আপনার অন্তরের সহানুভূতি নিশ্চয়ই তার দিকেই আছে। আপনি সত্য কথা বলুন, আপনার নিজের কী ধারণা? সাক্ষাৎ করলে আমার কোন বিপদ হবে না বলে আফজল খাঁ এই যে আশ্বাস দিয়েছেন, এর উপরে আস্থা করা কি নিরাপদ বলে মনে হয় আপনার?"

কিছুক্ষণ অধোবদনেই থাকতে হল ব্রাহ্মণসন্তান কৃষ্ণাজীকে। অবশেষে মুখ তুলে তিনি বললেন—"না, নিরাপদ হবে না বোধ হয়। আমি যতদূর বুঝেছি—খাঁসাহেবের অভিসন্ধি ভাল নয়।"

"অর্থাৎ ডেকে নিয়ে আমায় বন্দী বা হত্যা করবেন"—মৃদু হাস্য করলেন শিবাজী—"আপনাকে ধন্যবাদ কৃষ্ণাজী! শাঠ্যের জবাব শাঠ্য দিয়ে কীভাবে দিতে হয়, তাও শিবাজী জানে। আপনি গিয়ে বলুন খাঁসাহেবকে—দেখা আমি করব। তিনিও বেরিয়ে আসুন তাঁর ওয়াই-এর শিবির থেকে, আমিও বেরিয়ে যাব প্রতাপগড় দুর্গ থেকে। দুইয়ের মাঝপথে খুর্জা নদীর ধারে দেখা হবে আমাদের। কোন পক্ষেই দুটির বেশী সহচর থাকবে না। সে-সব সহচরও বিশ পা করে পিছনে থাকবে নিজ নিজ নেতার। শিবাজী একা, এবং আফজল খাঁও একা। দুজনেই নিরস্ত্র। এই অবস্থায় হবে সাক্ষাৎ।"

শিবাজীর হাতখানা এসে পড়ল আফজলের পেটের উপর।

আফজল খাঁ সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন। তিনি শুনেছেন—শিবাজী মানুষটা খর্ব এবং কৃশ। পক্ষান্তরে তিনি নিজে দশাসই পুরুষ, অসুরের মত পালোয়ান। না থাকুক কোন সহচর নিজের পাশে, না থাকুক তরোয়াল কটিতে, একখানা ছোরা তো পোশাকের ভিতর অনায়াসেই লুকিয়ে নেওয়া যাবে। আর কার্যসিদ্ধি তাতেই হবে।

শিবাজীও তৈরী হয়েছেন। বসনের নীচে পরেছেন লৌহ-বর্ম। হাতে পরেছেন দস্তানা, তার আঙ্গুলের ডগায় ইস্পাতের তীক্ষ্ণ ফলা লাগানো। এ অস্ত্রকে বলে বাঘনখ। এইভাবে সজ্জিত হয়ে তিনি যাত্রা করলেন ভবানী স্মরণ করে। সঙ্গে দু'জন সহচর—তানোজী আর বাজীপ্রভু।

খুর্জা নদীর কাছাকাছি আসতেই শিবাজী দেখলেন—আফজল খাঁও এগিয়ে আসছেন ওদিক থেকে, সঙ্গে দুটিমাত্র সৈনিক।

দুই পক্ষেরই সহচরেরা এক সময় থেমে গেল, শুধু ওদিকে আফজল খাঁ, এদিকে শিবাজী অগ্রসর হতে থাকলেন পরস্পরের পানে। দু'জন যখন একেবারে মুখোমুখি এসে পড়েছেন, তখন "আসুন রাজা শিবাজী, আসুন" বলে দুই হাত বাড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন আফজল।

আলিঙ্গন, না বজ্রপেষণ? বাঁ হাত দিয়ে শিবাজীর গলা জড়িয়ে ধরেছেন আফজল! দূরের সহচরেরা দেখছে প্রেমালিঙ্গন, শিবাজী দেখছেন, লোহার একটা সাঁড়াশি যেন পেঁচিয়ে ধরেছে তাঁর গলা, যতই এঁটে বসছে, ততই শ্বাসরোধ হয়ে আসছে তাঁর।

"কায়দা করেছি শিবাজীকে"—মনে মনে এই কথা বলে আফজল খাঁ পোশাকের ভিতর থেকে ছোরা টেনে বার করলেন, সবলে ঢুকিয়ে দিতে চাইলেন শিবাজীর বুকে। ঠিক এই আশঙ্কাই ছিল শিবাজীর, এর জন্য প্রস্তুতও তিনি ছিলেন আগে থেকে। ছোরা লোহার বর্মে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল। আর সেই সময়ে শিবাজীর হাতখানা এসে পড়ল আফজলের পেটের উপরে। হাতে সেই বাঘনখ। তার পাঁচটা ইস্পাতের

ফলা পাঁচখানা কিরিচের মত একসঙ্গে বিদীর্ণ করল দুর্বৃত্তের উদর, টেনে বার করল তার নাড়ীভুঁড়ি। আর্তনাদ করে ভূলুন্ঠিত হল আফজল।

পিছন থেকে দৌড়ে এল দুই পক্ষের সহচরেরা। ওদিকে "হর হর মহাদেও" জয়ধ্বনি তুলে ঝোপঝাড় পাহাড়ের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল লুক্কায়িত মারাঠা সৈনিকেরা। তারা পূর্ব রাত্রিতেই এসে আস্তানা গেড়েছে এখানে।

আফজল খাঁ নিহত, সেনাপতিহীন বিজাপুরী সেনা মারাঠা সেনার অতর্কিত আক্রমণে রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করল। তাদের শিবির লুণ্ঠন করে পাওয়া গেল যে সব ধনরত্ন, তা সমস্তই শিবাজী তুলজাপুরের মন্দির ও বিগ্রহ পুনর্গঠনের উদ্দেশে পূজারীদের হাতে তুলে দিলেন।

এরপর মুঘল আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত বিজাপুর সুলতান শিবাজী দমনের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা কোনদিন করতে পারেন নি।

হ্যাঁ, মুঘল বাদশাহ শাহজাহান এতদিনে মনোযোগ দিতে পেরেছেন দাক্ষিণাত্যের দিকে। বিজাপুর গোলকুণ্ডাকে শায়েস্তা করা এবং শিবাজীকে বশে আনয়ন করা—এই দুই কাজের ভার দিয়ে পুত্র ঔরংজেবকে তিনি পাঠিয়েছেন দক্ষিণাপথের রাজপ্রতিনিধি করে। কিন্তু ঔরংজেব সেকাজ ভাল করে শুরু করার আগেই তাঁকে দ্রুত ফিরতে হলো উত্তর ভারতের দিকে। কারণ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন সম্রাট্ শাহজাহান।

শিবাজী এবার নিরঙ্কুশ। পঁয়ত্রিশটা দুর্গ তিনি অধিকার করেছেন একে একে। তাদের পরিবেষ্টনীতে বিস্তীর্ণ এক ভূখণ্ড এসে গিয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনে। একেই কেন্দ্র করে উত্তরকালের মারাঠা সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল পেশোয়া বাজীরাওয়ের আমলে।

ওদিকে সারা উত্তর ভারত তোলপাড় হচ্ছে দারা-সুজা-ঔরঙ্গজেবের ত্রিমুখী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের রণতাণ্ডবে, এদিকে শিবাজী আত্মনিয়োগ করেছেন—অধিকৃত রাজ্যখণ্ডে সুষ্ঠু প্রশাসন গড়ে তুলবার জন্য। সমরাভিযান শুধু তখনই করতে হয়, যখন বিজাপুরী এলাকায় চৌথ আদায়ের সময় আসে। চৌথ হল রাজস্বের চতুর্থাংশ। নিজরাজ্যের বাইরে চৌথ আদায় করার এই ফন্দী গোড়ায় একান্ত প্রয়োজনের বশবর্তী হয়েই করতে হয়েছিল শিবাজীকে; নইলে দরিদ্র মারাঠা দেশে একটা শাসনযন্ত্র চালু রাখাই দুষ্কর হত অর্থাভাবে।

দিন যায়, দিল্লীর মসনদে স্থিরতা ফিরে এল আবার। পিতাকে কারারুদ্ধ, দারাকে হত্যা, সুজাকে বিতাড়িত এবং মোরাদকে বন্দী করে ঔরংজেব শক্ত হয়ে বসলেন ময়ূর সিংহাসনে। এইবার দাক্ষিণাত্যের দিকে মন দেবার সময় হল তাঁর। খবরও এসেছে খারাপ সেখান থেকে। শিবাজী সুরাট লুণ্ঠন করে কয়েক কোটি সিক্কা টাকা নিয়ে গিয়েছেন সেখান থেকে, এ বেয়াদপি

সহ্য করা সম্ভব নয়। দাক্ষিণাত্যে শায়েস্তা খাঁকে পাঠালেন বাদশাহ। উদ্দেশ্য শিবাজীকে শায়েস্তা করা। শিবাজী বিনা যুদ্ধে পুণা ছেড়ে চলে গেলেন রায়গড়ে।

শায়েস্তা খাঁ পুণা দখল করে শিবাজীর বাড়িতেই বসবাস করছেন, এমন সময়ে এক রাত্রিতে ক্ষুদ্র একদল মারাঠা সৈন্য অতর্কিতে এসে হানা দিল নগরে। এক বরযাত্রী দলের সঙ্গে মিশে ছদ্মবেশে তারা নাকি ঢুকে পড়েছিল পুণায়।

পঞ্চাশ হাজার মুঘল সৈনিকে পরিবেষ্টিত পুণানগরের অন্দরে বসে আছেন শায়েস্তা খাঁ। এখানে নৈশ আক্রমণের সম্ভাবনার কথা একবারও মনে হয় নি শায়েস্তার। বাতায়ন-পথে লাফিয়ে পড়বার সময় তাঁর হাতের বুড়ো আঙুল কেটে নামিয়ে দিল এক মারাঠা তরবারি। তাঁর পুত্র আলফতে হল নিহত। শায়েস্তা খাঁ পত্রপাঠ পালিয়ে বাঁচলেন সরাসরি দিল্লী। বাদশাহ এইবার পাঠালেন মীর্জা রাজা জয়সিংহকে এবং সেনাপতি দিলীর খাঁকে। শিবাজীকে যেন তেন প্রকারেণ বশীভূত করাই চাই।

জয়সিংহ বলপ্রয়োগের দিকে না গিয়ে মিষ্টবচন প্রয়োগ করতে লাগলেন প্রভূত পরিমাণে। শিবাজীকে বোঝালেন যে হিন্দুর স্বাধীনতা আনয়ন তাঁরও বাসনা। তার জন্য ধীরে ধীরে সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হবে। সন্ধি স্থাপন করে আপাততঃ শিবাজী একবার দিল্লীটা ঘুরে আসুন। মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তির পরিমাণ নিজে দেখে তার দুর্বলতাটা কোন্‌খানে, তা নির্ণয় করে আসুন আগে।

শিবাজী বোধহয় ভেবেছিলেন যে জয়সিংহ দিলীর খাঁর সঙ্গে সমুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মত শক্তি তখনও তিনি সঞ্চয় করতে পারেন নি। তবু দিল্লী যাওয়ার আগে তিনি জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হাতে পেয়ে বাদশাহ যে আমায় বন্দী বা নিধন করবেন না, তার নিশ্চয়তা কী?"

জয়সিংহ সগর্বে উত্তর দিলেন—"মীর্জা রাজা জয়সিংহ মধ্যস্থ হয়ে যাকে দরবারে পাঠাচ্ছেন, তার সঙ্গে অসদাচরণ করার মত সাহস বাদশাহের হবে না। আমি জামিন রইলাম, আপনার কোন ভয় নেই।"

দিল্লী দরবারে হাজির হয়ে শিবাজী কিন্তু সমাদর পেলেন না মোটেই। তাঁকে জানানো হল পাঁচ হাজারী মনসবদারের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে তাঁকে। শিবাজী ক্রুদ্ধ হয়ে প্রকাশ্য দরবারেই বলে উঠলেন—"সম্রাট্‌ কোনদিন দাক্ষিণাত্যে গেলে দেখতে পাবেন—শিবাজীর সেনাবাহিনীতে পাঁচহাজারী মনসবদারের সংখ্যা অনেক।"

এর ফল ভাল হতে পারে না। নিজের জন্য নির্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করা মাত্র শিবাজী দেখলেন—গৃহের চারিপার্শ্বে সশস্ত্র পাহারা বসেছে, অর্থাৎ তিনি বন্দী। জয়সিংহের প্রতিশ্রুতিকে কোন সম্মান দেন নি সম্রাট্‌, বিশ্বাস রক্ষা করেন নি আমন্ত্রিত হিন্দুরাজের

সঙ্গে। অন্য কেউ হলে নৈরাশ্যে মুষড়ে পড়ত তখুনি। কিন্তু শিবাজী মুষড়ে পড়ার মানুষ নন। তিনি পলায়নের ফিকির খুঁজতে লাগলেন।

প্রথমে তিনি করলেন পীড়ার ভান। তারপর প্রচার করলেন যে তিনি রোগমুক্ত হয়েছেন। রোগ-মুক্তির উপলক্ষে মন্দিরে মসজিদে সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহদের বাড়িতে বাড়িতে প্রত্যহ বড় বড় ঝোড়া-ভর্তি মিঠাই পাঠাতে লাগলেন বাহকদের মাথায় চাপিয়ে। প্রথম কয়েকদিন মুঘল প্রহরীরা ঝোড়া পরীক্ষা করে দেখত। শেষ দিকে আর দেখত না। সেই সুযোগে একদিন ঝোড়ায় ঢুকে বাহকের মাথায় চেপে সপুত্র শিবাজী পালিয়ে গেলেন দিল্লীর বাইরে।

বাহকের মাথায় চেপে সপুত্র শিবাজী পালিয়ে গেলেন।

মথুরা, এলাহাবাদ, পাটনা হয়ে অনেক ঘুরপথে শিবাজী মারাঠা দেশে ফিরলেন অবশেষে। মীর্জা রাজা জয়সিংহ ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন। দিলীর খাঁ অনেকগুলি মারাঠা দুর্গ জয় করে নিয়েছেন। কিন্তু শিবাজী ফিরে আসতেই ঘটনার প্রবাহ ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করল। হৃত দুর্গ এক এক করে সবই আবার উদ্ধার করে নিলেন শিবাজী। সুরাট আবারও লুন্ঠিত হল।

ঔরঙ্গজেব বুঝি মনে মনে পরাজয়ই মেনে নিয়েছিলেন। অথবা হয়ত জাঠ রাজপুত শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে অতিমাত্র ব্যস্ত হয়ে থাকায় শিবাজীর দিকে আর মনোযোগ দিতে পারেন নি। শিবাজী এইবার আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে উপবেশন করলেন ছত্রপতি উপাধি গ্রহণ করে।

কিন্তু ওদিকে দীপনির্বাণের সময় হয়ে এসেছিল। অভিষেকের মাত্র পাঁচ বৎসর পরে, মাত্র তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে হিন্দুসূর্য শিবাজী অকালে অস্তমিত হলেন। ঠিক ঐ রকম মহামানব তদবধি ভারতে আর একটিও আবির্ভূত হন নি।

শৈলেশ ভড়

রাত তখন অনেক হবে।

শিকাগোর প্রশস্ত রাজপথে তখন মধ্যরাত্রির নির্জনতা। অতন্দ্র প্রহরীর মত পথের দুপাশে আলোগুলো জ্বলছে সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে।

হিমলাগা শীতের রাত। মাঝে মাঝে দু একটা গাড়ি কিংবা ট্রাক হেডলাইট জ্বালিয়ে বিদ্যুতের মত ছুটে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিক কিংবা ওদিক থেকে এদিকে।

মোড়ের ট্রাফিক সিগন্যালগুলো যন্ত্রের সাহায্যে নিয়মিত জ্বলছে আর নিবছে। নিবছে আর জ্বলছে।

আশেপাশে আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো মড়ার মত নিঝুম নিস্পন্দ।

পথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ডক্টর ন্যাথানিয়াল ক্লিটম্যান।

চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি।

সামনের আকাশছোঁয়া একটি বাড়ির ছাতের কার্নিশ ঘেঁষে হেঁটে আসছে একটি ছেলে।

ডঃ ক্লিটম্যান তাকে চেনেন। ওর নাম ডোনাল্ড ইলিয়ট। বয়স মাত্র চোদ্দ। কিন্তু এত সাহস তার হল কি করে? একবার পা পিছলে গেলে আর তাকে বাঁচতে হবে না!

ছেলেটি সহজ পায়ে কার্নিশ বেয়ে এসে দেয়ালের গায়ের পাইপটা ধরে ফেললো।

ডঃ ক্লিটম্যান ভয়ে বোবা হয়ে গেলেন। একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন শুধু।

পাইপ বেয়ে ছেলেটি সরসর করে সোজা রাস্তায় এসে নামলো।

একটি পুলিসও দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল এতক্ষণ। এবার সে পিস্তলটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো ছেলেটির দিকে।

পিছন থেকে ডঃ ক্লিটম্যান এগিয়ে এসে পুলিসের হাতটা চেপে ধরলেন। বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

এ শহরের প্রায় সবাই তাঁকে চেনে এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে।

পিস্তলটা পকেটে রেখে পুলিসটি বললো, 'ব্যাপার কি ডঃ ক্লিটম্যান ?'

'অপেক্ষা কর এখনি বুঝতে পারবে।'

ছেলেটি এগিয়ে আসছে ওদের দিকেই। সহজ স্বাভাবিক পদক্ষেপ। মাথার টুপিটা কপাল অবধি নামানো। মুখটা দেখা যাচ্ছে না ভালো করে।

ছেলেটি ওদের ভ্রূক্ষেপ করলো না। সোজা বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে।

ডঃ ক্লিটম্যান একটু নীচু হয়ে কী যেন দেখলেন তারপর চুপি চুপি পুলিসকে বললে, 'এসো ওকে অনুসরণ করি।'

'আপনি ওকে চেনেন ?'

'হ্যাঁ চিনি। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই।'

'তাহলে আপনি যান।' বললে পুলিসটি, 'এই বিট ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না।'

'শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি।'

ডঃ ক্লিটম্যান চলতে লাগলেন ওর পাশে পাশে। হঠাৎ একটা তীব্র আলোর ঝলকানি এসে পড়লো ওদের মুখে।

প্রচণ্ড গতিতে একটা বিরাট ট্রাক আসছে। তারই হেডলাইটের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল ওদের মুখ। গাড়িটা এখনি বুঝি এসে পড়বে ওদের গায়ের ওপর।

চিৎকার করবার আগেই গাড়িটা ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল তড়িৎগতিতে।

ডঃ ক্লিটম্যান অবাক হয়ে দেখলেন ছেলেটির সর্বাঙ্গে ব্যস্ততার কোন চিহ্ন নেই। ধীর পদক্ষেপে সে এগিয়ে চলেছে সামনে নদীটার দিকে।

নদীর ধারে এসে জামা জুতো খুলে সে স্নান করলো, কিছুক্ষণ সাঁতার কাটলো। তারপর উঠে এলো জল থেকে। আর জামা জুতো পরে আবার ফিরে চললো বাড়ির দিকে।

তেমনি পাইপ বেয়ে উঠে কার্নিশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল বাড়ির মধ্যে।

সেইদিন সকালে ডঃ ক্লিটম্যান এলেন সেই ছেলেটির বাড়ি। এই পরিবারের সঙ্গে তাঁর অনেকদিনের বন্ধুত্ব। ডোনাল্ডের বাবা মিঃ ইলিয়ট তাঁর সহপাঠী।

হেডলাইটের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল ওদের মুখ। [পৃষ্ঠা ৭৭৯

বন্ধুকে সব কথা জানিয়ে ডঃ ক্লিটম্যান বললেন, 'ডোনাল্ডের ঘরের দরজা জানালা সব বাইরে থেকে এমনভাবে বন্ধ করে রাখবে যাতে সে কোনমতেই খুলতে না পারে।'

'ভয়ের কিছু নেই তো?' বললেন মিঃ ইলিয়ট।

'না, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে যাবে।'

বন্ধুকে নিয়ে মিঃ ইলিয়ট একেবারে চায়ের টেবিলে এসে বসলেন।

ডঃ ক্লিটম্যানকে দেখে ডোনাল্ড আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। বললে, 'আসুন আসুন। আপনি কতদিন যেন আসেননি। আজ কিন্তু আমাকে অনেক মজার মজার গল্প বলতে হবে।'

ডঃ ক্লিটম্যান সুন্দর হাসলেন, বললেন, 'সেইজন্যই তো এলাম। কিন্তু তুমি এত ভোরে স্নান করেছ কেন?'

'বুঝতে পারছি না' মুখটা শুকিয়ে গেল ডোনাল্ডের, 'ঘুম থেকে উঠে দেখি চুলটা ভিজে। মনে হচ্ছে স্নান হয়ে গেছে।'

'আমি তোমাকে আজ রাত্রে নদীতে স্নান করতে দেখেছি।'

'সে কি?' রীতিমত অবাক্ হল ডোনাল্ড, 'আমি কিন্তু আপনাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

'মনে না পড়াই তো স্বাভাবিক।' ডঃ ক্লিটম্যান এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'কারণ তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে।'

'ঘুমুচ্ছিলাম মানে?' পৃথিবীটা উল্টে গেলেও ডোনাল্ড বোধহয় এত অবাক্ হত না, 'ঘুমের মধ্যে হেঁটে গিয়ে আমি নদীতে স্নান করে ফিরে এসেছি?'

'হ্যাঁ, এটা একধরনের অসুস্থতা, একে বলে সম্নম্বুলিজম্। ভয় পাবার কিছু নেই বয়স হলেই সেরে যাবে।'

'কিন্তু কেন এমন হয় ?' কথাটা না জিজ্ঞেস করে পারলো না ডোনাল্ড।

'সে নিয়ে রীতিমত গবেষণা চলছে। কেউ বলেন বংশপরম্পরায় হয়ে থাকে। মনে অশান্তি থাকলে, স্কুলে মারধোরের ভয় থাকলে অথবা অল্পবয়সে বেশী চিন্তা করলে বা ব্রেনের কাজ করলে এ অসুখ হতে পারে। আবার সাবধানে থাকলে ভালোও হয়ে যায়।'

'ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানো—ভাবতে অবাক্ লাগে।'

'এই ঘুমের মধ্যে আমি রোগীকে ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার হাঁটতে দেখেছি। আর এমন সব দুঃসাহসিক কাজ তারা এত সহজে করে যে ভাবাই যায় না।'

'দু একটা বলুন না ডক্টর!' ডোনাল্ডের প্রশ্ন।

'ঘুমের মধ্যে রোগী টিকিট কেটে দিব্যি প্লেনে উঠে গেছে। বন্দুক নিয়ে শিকারের পোশাক পরে জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। বিছানা ছেড়ে গাছতলায় এসে শুতে দেখেছি।'

'সত্যি ?' কথাগুলো ডোনাল্ড যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

'সত্যি।' সুন্দর হেসে বললেন ডঃ ক্লিটম্যান, 'আকাশছোঁয়া বাড়ির ছাতের কার্নিশ বেয়ে খুব সহজে জলের পাইপ ধরে রাস্তায় নামতেও দেখা গেছে।'

ডোনাল্ড ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল শুধু। কথাগুলো সে যেন গিলছে। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'সে সময় এদের জাগিয়ে দিলে কি হয় ?'

'খবরদার।' সাবধান করে দিলেন ডঃ ক্লিটম্যান, তাহলে বিপদ ঘটতে পারে। কাছে এসে শরীর নাড়া দিয়ে তার ঘুম ভাঙালে হয় সে তোমাকে খুন করবে না হয়ত নিজে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। তবে একটিমাত্র উপায় আছে। তাকে দূর থেকে নাম ধরে ডাকা। একবার নয়, বারবার। প্রয়োজন হলে গলা ছেড়ে ডাকা যেতে পারে।'

'সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার।'

'এর চেয়েও' বললেন ডঃ ক্লিটম্যান, 'আরও একটি আশ্চর্যের ব্যাপার আছে সেটা শুনলে আরো অবাক্ হবে।'

'কী ?'

একটু চুপ করে থেকে ডঃ ক্লিটম্যান বললেন, 'ঘুমের মধ্যে রোগী উঁচু ছাতের কার্নিশ দিয়ে হাঁটে, চলন্ত গাড়ির সামনে দিয়েও চলে যায়, লাফিয়ে ট্রেনে ওঠে অর্থাৎ এমন সব বিপজ্জনক কাজ করে যা দুঃসাহসিকতার পর্যায়ে পড়ে কিন্তু সত্যি বলতে কি আজ পর্যন্ত

কোন রুগীকে কোন দুর্ঘটনায় পড়তে হয়নি। কোথাও কারোর এতটুকু আঘাতও লাগেনি। সমস্ত বিপদ আপদ তারা অতি সহজে এবং নিশ্চিন্তে কাটিয়ে যায়। এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কি ?'

কপালে বুকে আর দু কাঁধে হাত ঠেকিয়ে ক্রশ চিহ্ন আঁকলেন ডোনাল্ডের বাবা। মিঃ ইলিয়ট বললেন, 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আর কী বা বলা যেতে পারে।'

ও কি। তোমরা 'হাঁ' করলে কেন ? আশ্চর্য বলবে বলে বুঝি।

উল্কার ক্ষতির হিসাব—

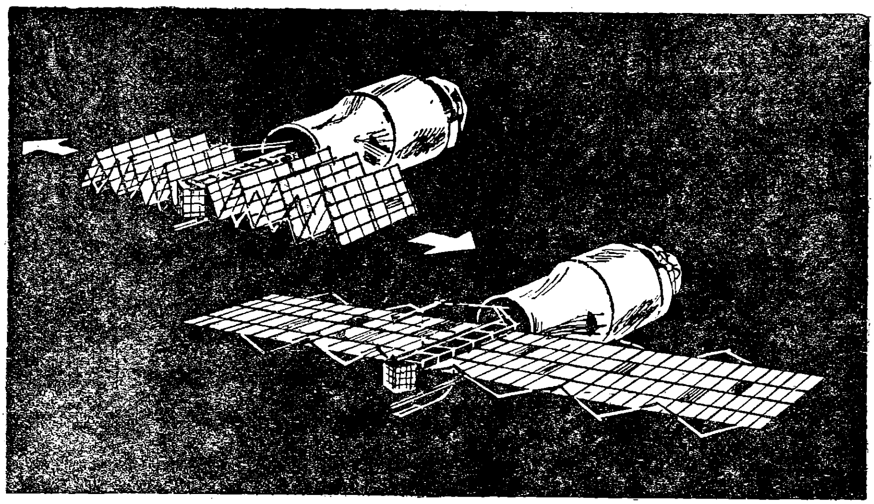

ছবিটা দেখে যন্ত্রটা কি অনুমান করা কঠিন। এটা আসলে হল এক বিরাট ডানাওলা মানুষের তৈরী উপগ্রহ। এই উপগ্রহটিকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কেপ কেনেডী থেকে মহাশূন্যে ক্ষেপণ করা হয়েছিল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মহাশূন্যে পৌঁছে এই উপগ্রহটির ডানা স্তরে স্তরে খুলে যায়। মহাশূন্যে ক্রমাগতই উল্কাপিণ্ড ছোটাছুটি করে। তার আঘাতে মহাশূন্যের মহাযানের কি ক্ষতি হতে পারে এই উপগ্রহতে উল্কার আঘাত লেগে যে গর্ত হয় সেই গর্ত দেখে আঘাতের পরিমাণ বোঝা যায়।

সেকালের গল্প

সুজাতা সেনগুপ্ত

সেকালে কোশল রাজ্যে বাস করতো এক বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী, তার পুত্রের নাম পূর্ণবর্ধন। একটিই ছেলে তাঁর, তিনি তাকে ভীষণ ভালবাসতেন। ক্রমে ছেলে বিয়ের যোগ্য হতে, নগরের বড় বড় ভাটদের ডেকে বললেন, 'আমার ছেলের যোগ্য পাত্রী চাই।'

'কেমন পাত্রী চান বলুন, খ'ুয়ে খ'ুয়ে এনে দেব।' বললে ভাটরা।

সোনার হারটি বিশাখার চুলে জড়িয়ে দিল,...

'এমন পাত্রী আমার চাই যার চেয়ে সুন্দর এই দেশে আর নেই, মুক্তোর মত তার দাঁতের পাটি, মেঘের মত চুল, অঙ্গ জুড়ে পদ্মের সুবাস, আর হাঁটলে সে পদ্ম ফোটে, কাঁদলে সে মুক্তো ঝরে।' এই বলে শ্রেষ্ঠী ভাটদের হাতে তুলে দিল সোনার মুক্তোমালা। 'এই মালা যার চুলে জড়িয়ে দেবে সেই হবে কনে!'

দশজন ভাট দশদিকে চলে গেল। এক বছর যায়—দুবছর ঘুরে যেতে না যেতে একদিন সবাই ফিরে চলে এল নিজেদের রাজ্যে। মেয়ে তাদের পছন্দ হয়নি। সেদিন ছিল রাজ্যে এক বিরাট উৎসব। সেই উৎসবে যোগ দিয়েছিল নগরের সবাই, ভাটরাও মিশে গেল সেই উৎসবের ভিড়ে।

সেই নগরীর এক শ্রেষ্ঠীর মেয়ে বিশাখা চলেছিল তখন স্নান করতে, সঙ্গে ছিল অনেক সখী তাকে চারদিক ঘিরে। এমন সময় নামলো বৃষ্টি, সব সখী ছুটে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নিল, পথের লোকেরাও। কিন্তু একটি মেয়ে তখনও চলছে তো চলছেই। তার চলার সৌন্দর্যে রূপের আভায় চতুর্দিকে যেন সত্যিই পদ্ম ফুটছে। ভাটরা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো। এই হল সেই মেয়ে বিশাখা।

চুল তো নয় যেন আকাশের মেঘ, মুখ দেখলে পদ্ম লজ্জা পায়, কিন্তু দাঁত দেখে কি করে? ভাটরা মতলব বার করলো। একজন বললো, 'আহা হাঁটা কি যেন রাজহস্তী।'

অপর জন বললে, 'এমন মেয়ে যার ঘরে যাবে তাকে সারাদিন উপোষ করেই কাটাতে হবে।' আরেকজন বললো, 'মেয়ের সব ভাল শুধু পায়েই বোধহয় দোষ আছে।'

বিশাখা বুঝলো এসব তাকেই বলা হচ্ছে কিন্তু সে চটলো না, আস্তে শুধু বললো, 'মেয়েদের সবার সামনে ছোটা ভাল নয়। ত'ছাড়া ছুটতে গিয়ে হাত-পা ভাঙলে চিরজীবন বাপের বোঝা হয়েই কাটাতে হবে।'

ভাটরা ইতিমধ্যে দাঁত দেখে নিয়েছে—আহা দাঁতগুলো যেন সত্যিই মুক্তোর পাটি। একজন তাড়াতাড়ি সোনার হারটি বিশাখার চুলে জড়িয়ে দিল, আর বললে, 'আজ থেকে তুমি শ্রেষ্ঠী পূর্ণবর্ধনের জন্য নির্বাচিত হলে।'

এই খবর চলে গেল বিশাখার পিতা শ্রেষ্ঠীর কাছে, তিনি খুব খুশী হলেন। ভাটরা ছুটলো পূর্ণবর্ধনের পিতার কাছে। তিনিও সব শুনে খুশী হলেন তারপর ঠিক হল বিবাহের দিন ও লগ্ন।

বিশাখার পিতার ধন দৌলতের শেষ নেই। তিনি পাঁচশ কর্মকারকে ডেকে বিশাখার অলংকার গড়ার ভার দিলেন, আর বিশাখা নিজে নিলে বরযাত্রীদের আপ্যায়নের ভার, কোনও দিকে কোনও ত্রুটি রইলো না। এদিকে নগরীতে নেমেছে বর্ষা, দীর্ঘ চারমাস এভাবে কেটে গেল। তারপর একদিন মেয়ে পাঠাবার দিন স্থির করলেন শ্রেষ্ঠী। যাওয়ার আগে মেয়েকে উপদেশ দিতে বসল শ্রেষ্ঠী। 'শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দশটি কাজ কখনও ভুলিসনে বিশাখা। ঘরের আগুন বাইরে নিস না, বাইরের আগুন ঘরে নিবি না। যে দেবে তাকেই দিবি, যে দেয় না তাকে দিবি না। শুধু বিশেষ জনকে দিবি সে কিছু দিক না দিক। ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে ভুলবি না। মান্য করবি গৃহদেবতাদের, আর সুখে থাকবি, সুখে খাবি, সুখে ঘুমাবি।'

পাশের ঘরে বসে সব শুনল পূর্ণবর্ধনের পিতা। ভাবলে, এ আবার কি উপদেশ? আসলে উপদেশের কিছুই সে বুঝলে না। এর অর্থ হল—শ্বশুর, শাশুড়ী বা স্বামীর নিন্দা বাইরে করবে না। বাইরের নিন্দা ভিতরে বলবে না। যে ধার শোধ করে তাকেই ধার দেবে, কিন্তু আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু ধার শোধ না করলেও তাদের দেবে। শ্বশুর, শাশুড়ী স্বয়ং অগ্নির মতো, তাঁদের মান্য করবে, এঁরাই তোমার ইহজীবনের গৃহদেবতা। তাঁদের খাইয়ে তবে খাবে, তাঁদের সামনে শুয়ে থাকবে না।

বিশাখার পিতার সঙ্গে ছিল আটজন মাতব্বর, যারা মেয়ের দোষ হলে বিচার করবে আর অসংখ্য দাসদাসী। এদের নিয়ে বিরাট মিছিল চলতে লাগল, বাজনা বাজিয়ে সারা রাজ্যের লোক দেখতে এল।

এরপর শুরু হল বিশাখার বধূ জীবন। সে তার পিতার উপদেশ সাগ্রহে পালন

কিছু হবে না—আপনি যান, উনি বাসী খাবার খাচ্ছেন।'

করতো। একদিন হয়েছে কি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এসেছেন ভিক্ষা নিতে কিন্তু তার শ্বশুর সেদিকে নজর না দিয়ে নিজে খেয়ে যেতে লাগলেন। বিশাখা বাধ্য হয়ে তাঁকে বললে, 'কিছু হবে না—আপনি যান, উনি বাসী খাবার খাচ্ছেন।'

বিশাখা নিজে ছিল বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী আর এঁরা জৈনধর্মে। তাই শ্রেষ্ঠী বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দেখেও না দেখার ভান করেছিল। বিশাখার এই কথা শুনে সে ভীষণ চটে গেল। বিশাখাকে ডেকে বললো, 'আমি সোনার থালায় পায়স খাচ্ছি আর তুমি বললে বাসী খাবার? তুমি এক্ষুণি বিদায় হও, এমন বউ আমার চাই না।'

বিশাখা সব শুনে বললে বিনীত ভাবে, 'আমার বাবা সঙ্গে যে আটজন মাতব্বর পাঠিয়েছেন, তাঁরাই আমার দোষের বিচার করবেন।'

অগত্যা তাঁদের ডাকা হল। তাঁরা সব শুনে বিশাখাকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন। তবু শ্রেষ্ঠী মানতে চান না। তিনি বললেন, 'ও ডাইনী বউ আমি চাই না, একদিন রাত্রে মশাল জ্বেলে সখীদের নিয়ে কোথায় গিয়েছিল আমি নিজে দেখেছি।'

বিশাখা বললে, 'সেদিন রাত্রে একটা তেজী ঘোড়ার বাচ্চা হয়েছিল। তার পরিচর্যার জন্য কেউ গেল না দেখে আমি গিয়েছিলাম।'

'তবে আমাদের মেয়ে নির্দোষ।'—বললে মাতব্বররা।

শ্রেষ্ঠীর রাগ তখনও পড়েনি, সে বললে, 'আসবার সময় ওর বাবা ওকে কি সব যা তা উপদেশ দিল, তার মানে কি ? এই সব কি ভালো কথা ? ছি ছি।'

তখন বিশাখা তাকে সব বুঝিয়ে বলাতে শ্রেষ্ঠীর ভুল ভাঙল, রাগও ভাঙল।

কিন্তু বিশাখা এবার অভিমানে বাপের বাড়ি যেতে চাইলো। তখন শ্বশুর নিজের ভুল স্বীকার করলো। বিশাখা তখন তাঁর কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিল যে সন্ন্যাসীদের মত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদেরও সে এই বাড়িতে খাওয়াবে।

শ্রেষ্ঠী অনুমতি দিল। বিশাখা স্বয়ং তথাগতকে নিমন্ত্রণ করে বসলো আর শ্বশুরকেও ডাকলো। এদিকে জৈনরা তাঁকে আসতে দিতে চায় না। শেষে শুধু আড়াল থেকে উপদেশ শুনতে অনুমতি দিল। আর আড়াল! উপদেশ শুনে দেখতে দেখতে কি হয়ে গেল, সমস্ত শ্রেষ্ঠীর পরিবারই বৌদ্ধ হয়ে গেলেন। জৈনরা তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন।

আর বধূ বিশাখার গুণের কথা দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শেষ জীবনে তিনি গগনস্পর্শী এক বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করে তার ভার দিয়েছিলেন বুদ্ধ শিষ্য মৌদ্গলায়নের উপর।

বিনা পয়সার ভোজ

কোন এক রেস্তোরাঁয় একটা ছাত্র বেশ ভুরিভোজ মারছিল। খাওয়ার শেষে পরিচারক একটা মোটা অঙ্কের বিল নিয়ে এসে সামনে ধরলে। পরিচারকের চাহনির ভঙ্গী দেখে ছাত্রটি বললে, তুমি আমায় চেন নাকি ?

পরিচারক সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

কোথায় আমায় দেখেছিলে ? ছাত্রটি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে।

এই হোটেলেই এক বছর আগে।

তোমার তো খুব স্মৃতিশক্তি !

আজ্ঞে সে ঘটনা আপনিও জানেন। বিলের টাকা দিতে পারেন নি বলে ম্যানেজারের আদেশে আপনাকে বাইরে ফেলে দিয়ে এসেছিলুম।

তাই নাকি ? ছাত্রটি খুশী হয়ে বলে। আজও তাই কর না কেন।

বিদেশী গল্প

সমাধান

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

কী পেল্লায় নদী এই দানিয়ুবটা। দেখলে ভয় করে। কিন্তু ওতে নেমে খানিকটা হুটোপাটি করতে পারলে লাগেও ভাল। এমন একটা জায়গা আছেও, যেখানে নামলে ভেসে যাবার ভয় নেই।

কী জান, একটা চামড়ার কারখানা আছে ওখানে। নদীর পাড়েই। চামড়া-ধোয়া জল নামে ঐখান দিয়ে। নামছে কত কাল থেকে। পাড়টা তাই ভেঙেছে খুব। খানিকটা জায়গা এমন হয়েছে যে তার জলের তিনদিকেই ডাঙ্গা। আর জলও সেখানে খু-উব কম। জেকব যে জেকব, আমার চেয়েও ছোট্ট, সেও ডোবে না সেখানে।

জায়গাটা ভাল, নাওয়া চলে। ডুবে যাবার ভয় নেই, ভেসে যাবারও না। তবে একটা বড় দোষ আছে ওর, জলটাতে বড় গন্ধ ওখানে। চামড়ার গন্ধ। তা আমরা মাঝে মাঝেই নামি কিনা ওখানে, আমাদের সয়ে গেছে। তেমন আর খারাপ লাগে না।

একসাথে নামি চারজন আমরা। জেকব—সে আমার চেয়েও ছোট। আঁদ্রিজ, সে একটুখানি বড় আমার চেয়ে। তাছাড়া আমি আর রোকা। রোকাকে না নিয়ে আমরা নামি না। ও যা সাঁতার দেয়! জেকব তো ওর গলা জাপটে ধরেই আছে। রোকা কুকুর হল আমার, কিন্তু ওকে দখল করে রাখে জেকব।

আমি কিছু বলি না তাতে। জেকবকে আমি খুব ভালবাসি। ছোট্ট হলে কী হবে, ওর বুদ্ধি খুব! ও জানে যে ডুবে মরলে ওর বাবা আর আস্ত রাখবে না ওকে। তাই ও রোকার গলা কিছুতেই ছাড়ে না। ওর বাবা পষ্টো বলে দিয়েছে—"নদীতে নাইবে, নাও। কিন্তু ডুবে মরলে তোমায় আমি দেখে নেব।"

ওর বাবার মত অমন দাড়ি আর কারও নেই। কী লম্বা, কী কালো আর কেমন কোঁকড়ানো। আমাদের মুদি ঐ জেকবের বাবা। আমার সঙ্গে দেখা হলেই মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। আর অমনি আমার চুল মাখনে মাখামাখি হয়ে যায়। গাঁয়ের সব্বাই ওর কাছে মাখন কেনে তো! কাজেই ওর হাতে লাগে মাখন। আর ওর হাত থেকে আমার চুলে। আমি তখন আবার চান করে মরি আর কি! আগে তো একবার করেইছি, তবু আবার না করে উপায় নেই। ঝকমারি!

তা ওর বাবা যেমনই হোক, জেকবকে আমি খু-উব ভালোবাসি। ওর বুদ্ধি খুব।

কেমন করে অত বুদ্ধি হল ওর, তা কে জানে! ইস্কুলের পরে সবাই আমরা মার্বেল খেলি। মার্বেল পুরোনো হয়ে গেলে জেকব সেগুলো নিয়ে নেয়। তার বদলে নতুন মার্বেল দেয় আমাদের। দাম না নিয়ে দেয় না, তা ঠিক। দামও নেয়, আবার পুরোনো মার্বেলও নেয়। ওর বুদ্ধি খুব। ওর বুদ্ধির জন্যেই ওকে এত ভালোবাসি।

বুদ্ধি আঁদ্রিজেরও খুব। ওর বাবা হল ঠিকেদার রাজমিস্তিরি। যত লোকের যত বাড়ি দেখছ, সব আঁদ্রিজের বাবা গড়েছে। সে বলে কী, জানো? বলে যে একটা বাড়ির গাঁথুনি যখন শেষ হবো-হবো হয়েছে, তখন একটা জ্যান্ত মিস্তিরিকে তার দেয়ালে গেঁথে ফেলতে হয়। এই যে এত এত বাড়ি দেখছ, সব বাড়িতেই আছে ঐরকম। আঁদ্রিজের বাবা নিজে বলেছে। সে নিজে হেড মিস্তিরি, সে আর জানে না?

কথাটা শুনতে ভাল লাগে না। তা ছাড়া আমার বিশ্বেসও হয় না। আঁদ্রিজটা তো মিথ্যুক। জল থেকে উঠে আমরা ঘাসের উপর বসে গায়ের মাথার জল শুকোচ্ছি। যাতে বাড়িতে কেউ ধরতে না পারে যে আমরা নদীতে চান করেছি। গায়ের জল শুকোচ্ছি আমরা, রোকা এসে, বসবি তো বোস একেবারে আমাদের শুকনো কাপড়ের উপরে। ভিজে ভিজেক্কার একেবারে। মার, মার, পাথর মেরে তাড়া ওটাকে। জলের ভিতর ওর গলা ধরেছিলাম বলে কি ও সগ্‌গে গেল নাকি? জামা ভেজাবে আমাদের?

আঁদ্রিজ একটা ঘাসের শিষ চিবোচ্ছে। হঠাৎ বললে কী, জানো? বলে বসল—“কাল বিকেলে ভগবানকে দেখলাম—”

আমি সোজা বলে দিলাম—“তুই মিথ্যুক—”

জেকব কিছু বলল না, খালি হাসল একটুখানি। ঐ-রকম যখন ও মুচকি হাসে একটুখানি, তখন এমন বুদ্ধিমান্ দেখায় ওকে! ও মুখে কিছু না বলুক, আমার বুঝতে বাকী রইল না যে জেকবও মিথ্যুকই ভাবছে আঁদ্রিজকে।

“মিথ্যুক!”—আঁদ্রিজ তেতে উঠল—“এই নদীর ধারেই। আমি বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধারে এলাম, দেখলাম সাদা এক টুকরো মেঘ আকাশে। ঠিক যেন পালকের বালিশ একটি। সেই সাদা মেঘ থেকে ভগবান উড়ে বেরুলেন, নদীর জলে পা ধুলেন, আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন একটু, তারপর আবার উড়ে চলে গেলেন।

এর পরে আমরাও আকাশের দিকে তাকালাম। মেঘ অবিশ্যি রয়েছে আকাশে, সাদা মেঘই। কিন্তু পালকের বালিশের মত মোটেই দেখতে নয়। বরং গাঁয়ের ভেড়াগুলোর মত ফুলো ফুলো। মিথ্যুক! মিথ্যুক! ঐ রকম মেঘ থেকে ভগবান কখনও উড়ে বেরুতে পারেন?

বললাম বটে ওকে মিথ্যুক, কিন্তু ধোঁকা রয়ে গেল মনে। যদিই ও দেখা পেয়ে

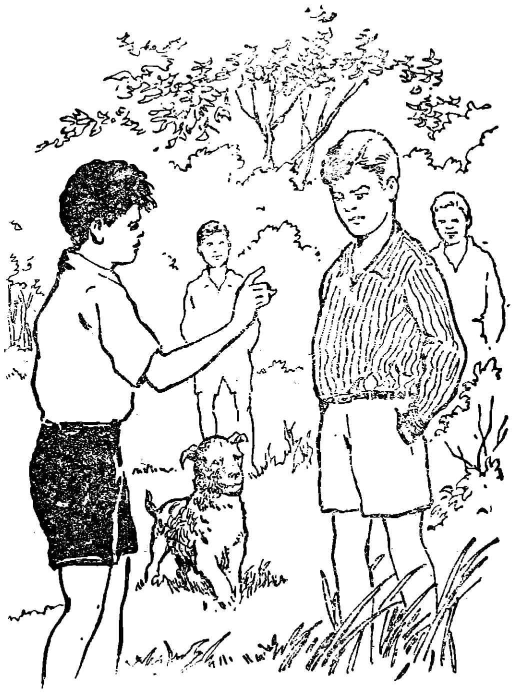

…কে সত্যি সত্যি? ভা-রী হিংসে হতে লাগল। আর দুটো বছর গেলেই দশ বছর বয়েস হবে আমার, কই, এখনও তো একদিনও দেখলাম না ভগবানকে।

জেকব? জেকবও দেখেছে নাকি? ও যদি দেখে থাকে তো বুঝবো—আমার উপর রাগ আছে ভগবানের! তুই আর সবাইকে দেখা দিলেও আমায় দেন না। আমি জেকবের কানে কানে বললাম—"তুই দেখেছিস নাকি?"

আর জেকব কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল, অমনি ফিসফিস করেই বলল—"ভগবানের কথা অমন করে বলতে নেই। বাবা বলেছেন ওতে পাপ হয়—"

আমি সোজা বলে দিলাম—"তুই মিথ্যুক—" [পৃষ্ঠা ৭৮৮

আমার বাবা কিন্তু অমন কথা বলেন নি কখনও। তাই ভাবলাম—বাড়ি গিয়ে বাবাকে জিগ্যেস করলেই বোঝা যাবে যে আঁদ্রিজটা সত্যি বলেছে, না মিথ্যে। আমি খোকাকে ডেকে নিয়ে উঠে পড়লাম। ও-ও উঠল।

বাবার সঙ্গে একসাথে বসে খেতে হলে আমার লোকসান হয়ে যায়। ভাল ভাল মাংসের টুকরোগুলি বাবার প্লেটেই পড়ে। হাড়ের ভিতর থেকে চুষে চুষে মজ্জা বার করে খেতে ভারী ভাল লাগে আমার। কিন্তু বাবা যেদিন টেবিলে থাকেন, আমার বরাতে লবডংকা সেদিন। সব হাড়ের টুকরোগুলো তুলে নিয়ে বাবা একটা একটা করে চুষবেন।

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই আছি, দেখছি বাবার মাংস-খাওয়া। হঠাৎ আঁদ্রিজের কথাটা মনে পড়ে গেল। অমনি বললাম—"বাবা! আঁদ্রিজ বলছিল সে নাকি ভগবানকে দেখেছে কাল! এও কি হয়?"

একটা হাড় চোষা শেষ করে বাবা সেটা ঠক করে প্লেটে নামিয়ে রাখলেন, তার পর বললেন—"তুই একটা গাধা—"

আরও কী বলতেন—তার ঠিক নেই; কিন্তু মা ওপাশ থেকে বলে উঠলেন—"কেন ছেলেটাকে মিছিমিছি বকছ ?"

বাবা এক টুকরো মাংস মুখে পুরেছেন, সেটা চিবোতে চিবোতে বললেন—"তুমিই আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খেলে ওর—"

এক কথায় দুই কথায় তুলকালাম ঝগড়া দুইজনে। বাবা উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তখন মাকে নিয়ে পড়লাম আমি। মা আমার ভারী ভাল। আর দেখতেও ভা-রী সুন্দর। একটু মোটা অবিশ্যি, তা তাতে কী হয়েছে? মাকে আমার একটুও ভয় করে না। তাঁকে জিগ্যেস করলাম আঁদ্রিজের ভগবান দেখার কথা। মা যে মা, তিনিও তিরিক্ষে হয়ে গেলেন—"আমি জানবো কেমন করে ?" বলে তিনিও উঠে গেলেন।

আমি ঠিক করলাম—এঁদের কাউকে দিয়ে হবে না, আমায় যেতে হবে কেটের কাছে। কেট আমাদের দাসী। মায়ের চেয়ে বয়েস নাকি অনেক কম। সত্যি মিথ্যে জানি নে, সে তো তাই বলে। মায়ের মত অমন সুন্দর নয়, তার উপর মায়ের চেয়েও মোটা। মেয়েটা সব জানে, স-ব। আর বলেও স-ব। জিজ্ঞেস করলেও বলে, না-করলেও বলে। বাচ্চা ছেলেরা কোথা থেকে আসে, তা সে বলেছে আমায়।

কেটের কাছেই যাব-যাব করছি, এমন সময় শহর থেকে দিদিমা এলেন। মায়ের চেয়েও অনেক বড়। মায়েরও মা তো! কিন্তু মায়ের মত মোটাসোটা নয়, চিম্‌সে পানা। সব সময় আঙ্গুল দিয়ে ঠোঁট দুটো টিপছেন। তা নইলে দাঁতের পাটি যে বেরিয়ে আসে! ওঁর দাঁত তো নিজের দাঁত নয়, বাঁধানো!

দিদিমা একা আসেননি, বার্টিমামাও এসেছেন সঙ্গে। দিদিমারই ছেলে উনি, আমার মায়ের ভাই, আর আমার মামা। বার্টিমামা নাকি পাগল। মাথার ভিতর ঘিলু নাকি জল হয়ে গিয়েছে। এখনও বেশ নরম-সরম মাটির মানুষটি ঐ বার্টিমামা। কিন্তু ডাক্তার নাকি বলেছে—এ ভাব বেশীদিন আর থাকবে না, ওর মাথা এমন গরম হয়ে উঠবে একদিন যে, যাকে দেখবে, তাকেই ধরে পিটবে। তখন বেঁধে রাখতে হবে ওকে।

বার্টিমামার কথা বাবা-মার মুখে অনেক সময়ই শুনি, কাজেই জানি সবই। ওকে দেখে তাই ভয় ভয় করতে লাগল। কি-জানি এক্ষুণি যদি মাথা গরম হয়ে ওঠে, আমাকে দিয়েই হয়তো পিটুনি-বিদ্যের হাতে-খড়ি নেবে।

একটু দূরে দূরেই আছি। সাঁঝের বেলায় নদীর ধারে গেলাম সবাই। দিদিমা, মা, বার্টিমামা, রোকা আর আমি। কাদা দিয়ে পিঠে তৈরি করতে ভারী মজা লাগে

বার্টিমামা আমার হাসি দেখতে পায় নি,…
[পৃষ্ঠা ৭৯২

ক্ষমার। আমি আপন মনে বসে তাই করছি, দেখি বার্টিমামা এসে পাশে বসেছে। "পিঠে হচ্ছে নাকি।"—বলেই সে নিজে হাত লাগাল মাটিতে। আর কী সুন্দর সব পিঠে যে গড়তে লাগল চটপট, আমি একেবারে থ মেরে গেলাম।

কয়েক মিনিটের ভিতরই ভাব হয়ে গেল মামার সঙ্গে। আমি দুটো একটে কথার পরেই জিগ্যেস করলাম—"মামা, তোমার মাথার ঘিলু জল হয়ে গেল কেন?"

মামার মুখটা কালো হয়ে গেল। সে মুখটা ওপাশে ঘুরিয়ে জবাব দিল—"দুই দুটো বউ যার, তার কী না হতে পারে?"

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। দুটো বউ তো কারও নেই! আমার বাবার নেই, জেকবের বাবার নেই, আঁদ্রিজের বাবার নেই। যতদূর দেখেছি, সে কারও এক বউ। তবে হঠাৎ বার্টিমামা—

কিন্তু মুখটা ওর কালো দেখেছি, আর বেশী ওকে ঘাঁটাতে সাহস পেলাম না। তবে হঠাৎ বার্টিমামাও অন্য কথা তুলল, বলল কী—"ভাগনে, আমায় তোমাদের গির্জায় নিয়ে যাবে একটিবার? শহরে ওরা আমায় নিয়ে যায় না। পাগল কিনা আমি, কখন কী করে বসি, এই ভয় আর কি!"

মামার কথা শুনে আমার মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। তক্ষুণি তাকে নিয়ে গেলাম গির্জায়। তখন লোকজন তো কেউ নেই ভিতরে, একটা মোটে আলো জ্বলছে বেদীর উপরে, তাইতেই যেটুকু যা আলো হয় অত বড় হলটায়। মামা একা একা বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ, তারপর আবার হাঁটু গেড়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। সারা সময়টাই তার মুখে শুধু শুনলাম—"ভগবান! রক্ষা কর! প্রভু যীশু! রক্ষা কর আমায়!" কথা তো নয়, সে যেন বুকফাটা কান্না।

পরের দিন বার্টিমামাকে নিয়ে দিদিমা চলে গেলেন। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় চুপি চুপি আমায় বললে মামা—"আমার বয়স বেশী নয়, মরব না শীগগির। যদি একদম ক্ষেপে যাই, ওরা হয়তো আমায় পাগলা গারদে পাঠাবে। সেখানে হয়তো অনেক বছর থাকব। তুমি ততদিন বড় হবে। তখন আমায় মাঝে মাঝে দেখতে যেও। আমি তোমায় চিনতেও হয়ত পারব না, তবু তুমি যেও। আর এক কথা মনে রেখো, তুই বউ কক্ষণো করো না—"

ওর কথার গোড়ার দিকটা শুনে মন খুব খারাপ হচ্ছিল, কিন্তু শেষের দিকে আমার বেজায় হাসি পেলো। ভাগ্যিস দিদিমা তখন এগিয়ে পড়েছেন অনেকখানি, ওকে তাড়াতাড়ি আসতে বলছেন, নইলে ট্রেন চলে যাবে। বার্টিমামা আমার হাসি দেখতে পায় নি, খুব বেঁচে গিয়েছি। দেখলে বেচারী পাগল কষ্ট পেত মনে।

ইস্কুলে গিয়ে আঁদ্রিজের সঙ্গে কথাই কইলাম না আমি। আমার এখনও মনে হচ্ছে—ভগবান-দেখা-টেখা ওর সব মিছে কথা। আমি কথা কইছি না দেখে ও ঝাল ঝাড়ল গিয়ে জেকবের উপরে—"এই ইহুদির বাচ্চা! অত ডাকটিকিট জমাচ্ছিস কেন?" —বলেই তার চোয়ালে এক ঘুষি।

একথা সত্যি জেকবেরা ইহুদি। কিন্তু তার দরুন তাকে মারতে হবে নাকি? আমি রুখে উঠতেই আঁদ্রিজ মোলায়েম করে বলল—"চোয়ালে ঘুষি মারলে চোয়াল শক্ত হয়। ইংরেজেরা ছেলেবেলা থেকেই সবাই সবাইয়ের চোয়ালে ঘুষোচ্ছে। তাইতেই ওদের অত শক্ত চোয়াল। জেকব তো ওদের দেশের টিকিটই জমিয়ে জমিয়ে পাঁজা করেছে। ও আর একথা জানে না?"

ইংরেজদের দেশের টিকিটই জেকব জমিয়েছে, তা সত্যি। ওর কাকা থাকে সে-দেশে। সে যত চিঠি লেখে, সব টিকিটই জমায় ও। কাকা কিন্তু মুদি নয় বাবার মতন। সে নাকি বই ছাপায়। নিজে লিখে ছাপে না, অন্যে লিখে আনে, কাকা ছাপায়। তার নাকি দেদার পয়সা। তা পয়সা জেকবের বাবারও কম নয়। কেউ বলে—পয়সা নেই, এমন ইহুদি হয় না।

জেকব ঘুষি খেয়ে একটু মুচকি হেসেছে শুধু। ঐ রকম হাসলে কী বুদ্ধিমানই যে ওকে দেখায়! কথা যা কইল, তাই কি কম বুদ্ধির কথা নাকি? বলল—"আঁদ্রিজ, ইহুদি বলে তো আমায় ঘেন্না করছ। কিন্তু তোমার দেবতা যে যীশুখ্রীষ্ট, তিনি কি তোমাকে এই শিখিয়েছেন যে খেলার সাথীকে মেরে চোয়াল ভেঙে দিতে হবে?"

আঁদ্রিজ মহা ফাঁপরে পড়েছে, টের পেলাম তার মুখ দেখেই। কী জবাব দেবে, বুঝতে পারছে না। তবে জবাব দেবার দায় থেকে সে বেঁচে গেল। প্রাঙ্ক মশাই কেলাসে ঢুকলেন। আমাদের কেলাসের মাস্টারমশাই ঐ প্রাঙ্কই। তিনি ইতিহাস পড়ান, কবিতা পড়ান, আঁক কষান, নানান দেশের ম্যাপ দেয়ালে টাঙ্গিয়ে টাঙ্গিয়ে ভূগোল শেখান—

যখন যা পড়াবেন, গোড়ায় আমাদের দেশের কথা খানিকটা তাঁর বলাই চাই। আজ এখন কবিতা পড়বার কথা আমাদের, তিনি শুরু করলেন আমাদের জাতির ইতিহাস আওড়াতে। আমরা হাঙ্গেরিতে চিরদিন ছিলাম না। ছিলাম বহু-বহু দূর দেশে। সেখানে এত বেশী বেশী ছেলেমেয়ে হতে লাগল আমাদের যে জায়গায় আর কুলোয় না।

তখন এই ধর, হাজার খানিক বছর আগে আমরা কয়েক হাজার লোক সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম নতুন দেশের খোঁজে। পথে যে দেশের উপরই পড়লাম আমরা, সে সেই হার মানল। কিন্তু সে সব দেশ আমাদের বাসের যুগ্যি নয়। আমরা চলতেই আছি, লড়াই করছি আর চলতেই আছি। অবশেষে জায়গা পছন্দ হল এই দানিয়ুবের ধারে। আমরা এখানেই নতুন বসতি গড়লাম।

লড়াইয়ে আমরা কখনও হারি না। সে যুগেও হারিনি, এখনও না। অস্ট্রিয়েরা, রুশেরা, কতবার যে হেরেছে আমাদের কাছে, তার লেখাজোখা নেই। আমাদেরই রাজা এখন অস্ট্রিয়া দেশটাও শাসন করছেন, ঐ যে রাজার ছবি দেয়ালে। অন্য দেশ তাঁবে রাখতে হলে সেখানে গিয়ে বাসও করতে হয় রাজাকে। তাই আমাদের রাজা অস্ট্রিয়ার রাজধানীতেই বেশির ভাগ সময়ই থাকেন। কিন্তু ভাল তিনি আমাদেরই বাসেন, তাদের না।

আমাদের লোক কম, দুশমন আমাদের অনেক। তবু আমরা হারি না। যতদিন না জিতি, ততদিন লড়তেই থাকি। এইভাবে আমাদের অনেক বীর মরেছেন, আমরাও যদি মরি, সে হবে আমাদের গৌরব। তবে আমাদের, অর্থাৎ প্রাঙ্ক মশাইয়ের ছাত্রদের মরবার এখনও অনেক দেরি আছে। ততদিন কিছু পড়াশুনা করে নিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

রোজ যেমন হয়, এই মুখপত্তনেতেই ঘণ্টা প্রায় কাবার হয়ে এল। তারপর কবিতার বই খুলে নিয়ে প্রাঙ্ক পড়তে লাগলেন একটি কবিতা। কবির নাম পিকোকি। আমাদের দেশের সেরা কবি, বললেন প্রাঙ্ক। রুশদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি মারা যান! তাঁর সে গৌরব—যাক সে কথা।

কবিতার এক জায়গায় বলা হয়েছে—পৃথিবীটা হল যেন ভগবানের টুপি, আর হাঙ্গেরি হল সেই টুপির-উপর-বসানো ফুলের তোড়া। কবিটি আর কবিতাটি যে কত সুন্দর, প্রাঙ্ক তা শতমুখেও বলে শেষ করতে পারছেন না, এমন সময় ছোট্ট জেকব উঠে দাঁড়িয়ে বলল—“স্যার—”

“কী ?”—কবিতায় মশগুল প্রাঙ্ক চমকে উঠলেন একেবারে।

“স্যার, ভূগোল পড়াবার সময় আপনি বলেছিলেন পৃথিবীটা ফুটবলের মত। এখন আবার কি বলছেন পৃথিবীটা টুপির মত—এ কেমন কথা হল ? কোন্‌টা ঠিক ?”

[illegible]। প্রাঙ্ক দিশেহারা। প্রাঙ্ক জবাব খুঁজে পান না।

অবশেষে বেশ খানিকক্ষণ ঢোঁক গিলে গিলে তিনি বললেন—"ঠিক বলতে গেলে ফুটবলটাই হয়ত ঠিক। তবে কী জান, পিকোকি ছিলেন কবি। মস্ত-বড় কবি। কবিরা বেঠিক কথাও এমন সুন্দর করে বলেন যে তখন তখন মনে হয়—বেঠিকটাই ঠিক। বলার কায়দাটি সুন্দর বলেই বেঠিক কথা বললে ওঁদের কেউ মিথ্যুক বলতে পারে না।"

আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। দুইদিন ধরে মনের ঘাড়ে একটি বোঝা চাপানো ছিল, সেটা সড়াৎ করে খসে পড়ে গেল। ইস্কুলে এসে অবধি আঁদ্রিজের সঙ্গে কথা বলি নি, সেজন্য হল অনুতাপ।

ভগবান দেখা? ওটা বেঠিক কথা হতেও পারে। কিন্তু আঁদ্রিজ যদি কবি হয়, তাহলে তো বেঠিক কথা কওয়ার জন্য তাকে মিথ্যুক বলা যাবে না আর। ভগবান রক্ষে করেছেন। আঁদ্রিজ তাহলে মিথ্যুক নয়। হয়তো কবি! অতি উঁচু দরের কবি!

* জোসেফ বার্ড-রচিত "দ্য টেল অব্ এ চাইল্ড" অবলম্বনে।

সাবান হল কবে

বলতে পার কবে প্রথম সাবান আবিষ্কার হয়? যতদূর জানা যায় অতীতে রোমানরা সাবান ব্যবহার করত! সাবানের কথা যখন মানুষ জানতো না তখন তারা তেল, মাটি অথবা ছাই দিয়ে নিজেদের শরীর পরিষ্কার করত। প্রাণিজ চর্বি এবং লাইয়ের সাহায্যে সাবান তৈরী অনেক পরের ঘটনা।

শিক্ষাকে শ্রদ্ধা

এখনও ওদেশের ছেলেমেয়েরা ডিগ্রী-নিতে যাবার সময়ে গায়ে ধড়াচুড়া আর মাথায় টুপি পরে কনভোকেসানে যেতে হয়। এইতে বোঝা যায় শিক্ষাকে তারা কত শ্রদ্ধা করে।

রোমন্থন

শ্রীআশীষকুমার দাশ

ডালহৌসি স্কোয়ার।

সকালবেলার অফিস-যাত্রীদের কর্মব্যস্ততায় সরগরম। ফুটপাতের এক ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছেন বৃদ্ধ নুটুবিহারী সরকার। বয়সের ভারে কিছুটা নুয়ে পড়েছেন। সর্ব অঙ্গে দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট ছাপ। গায়ে একটা ছিন্ন, অধমলিন হাফশার্ট। পরনের ধুতিটাও শতছিন্ন, দারিদ্র্যকে ঢেকে রাখবার জন্য ছিন্ন জায়গায় সেলাইয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট। পায়ে একটা ক্যাম্বিসের জুতো, চশমার এক প্রান্তের কাঁচটি লুপ্ত। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ির সমারোহ।

—"স্যার।"

সবিস্ময়ে চমকে পশ্চাতে ফিরে তাকান নুটুবিহারীবাবু।

একটা মাঝবয়সী ছেলে খুব তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে আসছে। ছেলেটা তার কাছে এসেই পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

—"স্যার আমাকে চিনতে পারছেন?"

নুটুবিহারীবাবু তবুও যেন ঠিক চিনে উঠতে পারলেন না। চেনবার আগ্রহ নিয়ে হতভম্ব ছেলেটির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

ছেলেটিই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলল,—"স্যার, আমি আপনার ছাত্র অমৃতাংশু। স্যার চিনতে পারছেন না? যাকে আপনি একদিন বিপথ থেকে সরিয়ে এনে সুপথে…"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি, তোকে চিনতে পারবো না?" আস্তে আস্তে নুটুবিহারীবাবুর মনটা চলে যায় বছর পনের আগের স্কুল জীবনের কোন একটা দিনের ঘটনায়।

অঙ্কের 'পিরিয়ড'। শিক্ষক মহাশয় বোধ করি মিনিট দশেক হলো ক্লাসে এসেছেন। অঙ্ক শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের শ্রেণীর কাজের জন্য কয়েকটা অঙ্ক 'বোর্ডে' টুকে দিয়ে চেয়ারে বসে রয়েছেন। ছাত্রেরা যে যার অঙ্ক করছে।

হঠাৎ- প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীকক্ষে হাতে একটা বেত নিয়ে ঢুকলেন। সচকিত ছাত্রেরা সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াল। বসার অনুমতি পেয়ে পরমুহূর্তেই ছাত্রেরা যে যার জায়গায় বসে পড়ল।

ভয়ে সবাই তটস্থ। প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীকক্ষের অখণ্ড নীরবতাকে ভঙ্গ করে অমৃতাংশুকে নিজের কাছে ডাকলেন। অমৃতাংশু প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে এসে দাঁড়ালো।

অমৃতাংশু প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পা জড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো।

অন্যান্য ছাত্রদের দৃষ্টি প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও অমৃতাংশুর প্রতি স্থির নিবদ্ধ।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলতে লাগলেন,—"অমৃতাংশু তুমি দিন দিন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। আজ সহপাঠীর সঙ্গে মারামারি, কাল শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি অপমানকর উক্তি নিক্ষেপ, পরশু স্কুল পালিয়ে গিয়ে বদ ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করা, ক্লাসে পড়াশোনা না করে গণ্ডগোল করা, এসব কি তোমার স্বভাবে পরিণত হয়েছে? রোজই তোমার বিরুদ্ধে কোন না কোন অভিযোগ থাকবেই থাকবে। তোমাকে কতদিন বুঝিয়েছি, আদর করেছি, ভাল হবার সবরকম চেষ্টা করেছি, তাতেও কি তুমি তোমার স্বভাব শোধরাবে না? তুমি কি এই ভাবেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবে? না, না, না, তা হতে পারে না, তা কখ্খনো হতে পারে না।"

মুহূর্তের মধ্যে প্রধান শিক্ষক মহাশয় কিরকম যেন পালটে গেলেন। হস্তধৃত বেতটা নিজের গায়ে সপাং সপাং করে মারতে লাগলেন। সমস্ত ছাত্র এবং অঙ্কশিক্ষক মহাশয় বেতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অমৃতাংশু অনতিবিলম্বে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পা জড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো।

সে এক অবর্ণনীয় অবস্থা। নিজের গায়ে বেত মারতে মারতে এক সময় প্রধান শিক্ষক মহাশয় ক্লান্ত হয়ে বেতটা ফেলে দিলেন। ছাত্ররা এবং শিক্ষক মহাশয় তখন প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের উত্তেজিত অবস্থাটাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করতে লাগলো।

এক একটি মুহূর্ত যেন এক একটি যুগের সমতুল্য। এরকম অসহনীয় কয়েকটা মুহূর্ত অতিবাহিত হবার পর প্রধান শিক্ষক মহাশয় উঠে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে তিনি অনেকাংশে প্রকৃতিস্থ। অমৃতাংশু তখনও পা জড়িয়ে ক্ষমা চাইছে। শেষ পর্যন্ত সে প্রধান শিক্ষক

মহাশয়কে প্রতিশ্রুতি দিলো, সে অবিলম্বে তার স্বভাব শুধরে ফেলবে, নিয়মিত পড়াশোনা করবে এবং বদসঙ্গ পরিহার করবে।

সমগ্র ঘটনাটাকে এতক্ষণ রোমন্থন করছিলেন তখনকার অর্থাৎ বিগতদিনের প্রথিতযশা ছাত্রপ্রিয় প্রধান শিক্ষক মহাশয় নুটুবিহারী সরকার।

বছর পনের আগে যে ছিল উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিমূর্তি, যার অত্যাচারে সবাই ছিল আতঙ্ক, যে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ঘুরে বেড়াত; সে আজ বিনয় ও সংযমের সংমিশ্রণে তৈরী এক আদর্শ ছেলে, তার জীবনাদর্শ এখন যে কোন লোকের বড় হবার অনুপ্রেরণা যোগায়।

কয়েক ফোঁটা আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল অমৃতাংশুর পায়ে। এই উষ্ণ আনন্দাশ্রুর স্পর্শে অমৃতাংশু কিরকম বিহ্বল হয়ে পড়ল।

"অমৃতাংশু" কতদিনের হারানো সেই সুরে সেই নাম যেন অমৃতের ন্যায় অমৃতাংশুর কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো।

অমৃতাংশু সম্বিত ফিরে পেলো।

—"স্যার, আপনার ইচ্ছামত আমি এখন বিচারক হয়েছি।"

"বিচারক হয়েছিস" ভাবপ্রাবল্যে দুহাতে অমৃতাংশুকে জড়িয়ে ধরে নুটুবিহারীবাবু।

সাঁতার কাটা কল

লোকটি জলের মাথায় ডুবুরী মুখোশ পরে পায়ে ব্যাঙ-পা আর হাতে একটা ফানুস ধরে সাঁতার কাটছে। আসলে হাতে ধরা জিনিসটা ব্যাটারিতে চলা একটা কল। এই কলের সাহায্যে ডুবুরী বিনা পরিশ্রমে জলের মধ্যে ঘণ্টায় ৩ মাইল বেগে চলাফেরা করতে পারে। এদিক-ওদিক ঘুরতে হলে লোকটি দেহের সাহায্য নেয়। মুখোসের সাহায্যে এক ঘণ্টা ডুবে থাকতে পারে।

বোকা হীরু   ছবিতে গল্প   (পূর্বানুবৃত্তি)   মৈত্রেয়ী মুখার্জী

সন্ধ্যেটা বেশ সুন্দর কাটলো। এখন তোমার ঘুমানোর সময়। আমার লোকজনেরা তোমাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দেবে।
হীরুর শোবার ঘরে।
আমি আপনার পোষাক খুলে দিচ্ছি।
এই সালোয়ার পরুন।
খুব শীঘ্র হীরু ঘুমানোর জন্যে তৈরী হলো।
শুভরাত্রি হীরু।
শুভরাত্রি। বিড়াল বন্ধুরা।

পরের দিন সকালে বিড়ালেরা ওর ঘরে ঢুকলো।
উঠে পড়ুন হীরুবাবু জল খাবারের সময় হয়েছে
একটি বিড়াল ওকে ঠেলে উঠিয়ে দিলো।
আর একটি বিড়াল ওর মুখে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিলো
ঠাণ্ডা জলে ঘুম ভেঙ্গে যাবে।
তৃতীয় বিড়ালটি তার ল্যাজ দিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দিলো।
কী নরম আমার গামছাটি!

পুসির প্রাসাদে আসার প্রথম দিনে, হীরু প্রায় কিছুই কাজ করল না।
কি মজায় সাতটা বছর কাটানো যাবে! কলুর কলে কাজ করার চেয়ে অনেক মজার ব্যাপার।
সেই দিন, হীরু প্রাসাদের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।
নমস্কার-ভাই। মনে হচ্ছে তুমি খুব পরিশ্রমের কাজ করছ।
তোমার কুড়ুলটা এমন চকচক করছে কেন?
এটা সোনা আর রূপা দিয়ে তৈরী। আচ্ছা, তুমি একটু কাঠ কাটতে চেষ্টা কর না কেন?
ঠিক বলেছ! এটা খুব মজার খেলা হবে।

(চলবে)

কালচক্রের সওয়ার

[এইচ. জি. ওয়েলস্-এর "দ্য টাইম-মেসিন" অবলম্বনে]

শ্রীবৈজ্ঞানিক

নাম? নাম বলে আর অত বড়ো বিজ্ঞানীকে বিব্রত করতে চাই না। বন্ধু-জনেরা আদর করে তাঁকে ত্রিকালপন্থী বলে ডাকেন। আমরা আরও একটু সংক্ষেপ আর সরল করে নেব ঐ ডাক-নামটাকে, বলব "তেরকেলে"।

ঐ বন্ধুদের নিয়েই কথা শুরু করতে হয়। তেরকেলের বন্ধু যে কত, তার লেখা-জোখা নেই। বিভিন্ন বৃত্তির, বিভিন্ন বয়সের লোক তাঁরা। একটা বিষয়ে শুধু মিল আছে তাঁদের মধ্যে। সবাই শিক্ষা আর সংস্কৃতির দিক দিয়ে উঁচু পর্যায়ের লোক।

সেদিন তাঁরা কয়েকজন ডিনারের বেশ কিছু আগেই এসে পড়েছেন তেরকেলের বাড়িতে। সব বন্ধুরই বাঁধা নিমন্ত্রণ এখানে। প্রতি বৃহস্পতিবার এসে তাঁরা ডিনারের টেবিল অলংকৃত করবেন।

তা, আগেই এসে পড়েছেন যখন, কী আর করবেন, ঘুরতে ঘুরতে ল্যাবরেটরিতেই এসে ঢুকলেন। গৃহকর্তা সেখানেই রয়েছেন। একটা বুক-সমান উঁচু টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে।

"এটা কী হে?"—টেবিলের উপরে একটা বৃহৎ যন্ত্রের দিকে আঙ্গুল তুলে তাঁরা জানতে চাইলেন—"কী এটা? সাইকেলের মত, অথচ সাইকেল নয়?"

—"সাইকেলই"—হাসিমুখে জবাব দিলেন ত্রিকালপন্থী—"তবে চাকাহীন সাইকেল। চাকার দরকার তো স্থানগত দূরত্ব অতিক্রম করতে? আমার এ-যন্ত্র যে-দূরত্ব অতিক্রম করবে, সেটা স্থানগত নয়, কালগত। তাই দেখ, চাকার বদলে কাঁটা বসিয়েছি কতকগুলি। এই কাঁটাটা একশো বছরের, এইটে হাজার বছরের, এইটে লাখ, এইটে কোটি—"

ধমক দিয়ে উঠলেন মনস্তাত্ত্বিক বন্ধু—"আরে, কী সব বলছ আবোল-তাবোল? হাজার বছর, লাখ বছর···এ সবের মানে কী?"

"মানে এই যে, এই যন্ত্রে চড়ে হাজার বছরের কাঁটা ঘুরিয়ে দিই যদি, চক্ষুর পলকে আমি হাজার বছর পরের ভবিষ্যৎ কালে পৌঁছে যাব"—

সবাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন ত্রিকালপন্থীর পানে। এমন আজগুবী কথা ধাঁ করে যদি তাঁরা বিশ্বাস করতে না পেরে থাকেন, কে তাঁদের দোষ দেবে?

তেরকেলে বিজ্ঞানী বুঝলেন তাঁদের অবস্থাটা—ছোট ছেলেদের যেভাবে পড়া বুঝিয়ে

[illegible]ই, সেইভাবে বলতে লাগলেন—"স্থানের দূরত্ব অতিক্রম করবার জন্য গাড়ি [illegible] আছে, রেল স্টীমার ব্যোমযান—কত কীই তো চালু হয়েছে, আরও হবে [illegible] কিন্তু কালের দূরত্ব অতিক্রম করবার মত কোন যানবাহন এ-যাবৎ কিছু আবিষ্কার হয় নি. সেই অভাবটা পূর্ণ করবারই চেষ্টা করছি আমি—"

"চেষ্টা যদি সফল হয়?"—অবিশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠল মনস্তাত্ত্বিকের প্রশ্নে।

সফল হলে, ঐ তো বললাম, ইচ্ছামত ভবিষ্যকালের যে-কোন যুগে আমি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব নিজেকে, এই চর্মচক্ষু দিয়ে দর্শন করতে পারব—বিশ হাজার বছর পরের [illegible] অবস্থা, বা লক্ষ বছর পরের ভূপ্রকৃতির পরিবর্তিত চেহারা। ঐ যে জিনটা দেখছ, ওটাতে চড়ে বসব। এই যে কাঠিটা দেখছ, এটাকে এই গর্তে ঢুকিয়ে আস্তে করে চাড় [illegible] একটু, আর সারি-সারি সাজানো ঐ যে কাঁটাগুলি, ওর যেটা খুশী ঘুরিয়ে দিয়ে হাজার [illegible] বছরের ওপারে পৌঁছে যাব সাঁ করে—"

দুই মিনিট সবাই নিস্তব্ধ। এই খামখেয়ালী বিজ্ঞানী বন্ধুর আত্মপ্রত্যয়কে হেসে উড়িয়ে [illegible] হলে কী ভাষায় সেটা দেওয়া যায়, তাই বোধহয় ভাবছিলেন তাঁরা। দুই মিনিট অন্তে কিছু তাঁদের দিক থেকে একটা মাত্র নিরীহ প্রশ্নই এল—"যন্ত্র শেষ হয়েছে? না কি হতে বাকি আছে এখনও?"

উত্তর হল—"শেষ হয় নি, তবে দেরিও হবে না। আগামী বৃহস্পতিবারে যখন তোমরা [illegible] এ-বাড়িতে, তখন হয়তো আমি দশ বিশ হাজার বছর পরের ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এক চক্কর ঘুরে এসে সদ্য-লব্ধ অভিজ্ঞতার গরম গরম গল্প শোনাতে পারব তোমাদের—"

পরের বৃহস্পতিবারে বন্ধুরা এলেন যখন, তেরকেলে বিজ্ঞানী দৃশ্যমান নন। ঘর-করুনী [illegible] বললেন—"কত্তাকে দেখতে পাচ্ছি না বেলা দশটার পর থেকে। ল্যাবরেটরি ঘর বন্ধ, তিনি ভিতরে থাকতেও পারেন, না-ও পারেন। সাড়া পাচ্ছি না কিছু। তবে ঐ [illegible] সময় তিনি আমার হাতে এই চিঠিখানা দিয়েছিলেন, আপনাদের দেবার জন্য—"

চিঠি হাতে হাতে ঘুরতে লাগল অতঃপর। তেরকেলে তাতে লিখছেন—

"আমি যদি সময়মত ফিরতে না পারি, তোমরা খেতে শুরু করে দিও, আমার ভাগের খাবারটা এক পাশে সরিয়ে রেখে। হিসাবের চাইতে বেশী সময় লেগে গেল "কালচক্র" শেষ [illegible] এইমাত্র কাজ সেরে উঠে দাঁড়িয়েছি। একবার হাতে-কলমে পরখ না করে [illegible] পাচ্ছি না। তার উপর, তোমাদের কাছে প্রতিশ্রুতও আছি—সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার গল্প তোমাদের শোনাব বলে। সেই অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করতে বেরুচ্ছি।

কালচক্র নামটা বেশ লাগসই লাগছে না? যদিও চাকা নেই—"

তোমাদের তেরকেলে

"ভালোয়-ভালোয় ফিরলে হয়"—বললেন মনস্তাত্ত্বিক বন্ধু।

"ঠিক ফিরবে। ততক্ষণ এসো আমরা ডিনার শুরু করে দিই। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কিছু না"—বললেন সাংবাদিক।

তেরকেলে-বিজ্ঞানী তখন কোথায়?

গোড়া থেকেই বলা যাক তাঁর কাহিনী। সেই সকাল দশটা থেকে।

না, দশটা নয় ঠিক, একটা মিনিট বাকী আছে তখনও দশটা বাজতে। কালচক্রের শেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ষোল আনা খুশী হয়ে তেরকেলে ঠিক সেই সময় চড়ে বসলেন জিনের উপরে। দুই হাতে দুটো কাঠি। একটা হলো ভবিষ্যদর্শনের ছাড়পত্র, অন্যটা অতীতদর্শনের। প্রথমটা ঢুকিয়ে দিলেন নির্দিষ্ট একটা ফুটোর ভিতরে, তারপরে সামান্য একটা চাড়।

মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো বোঁ করে। হঠাৎ মনে এল একটুখানি সংশয়। "এটা কী করে বসলাম? এর পরিণাম কী?" ভয় পেয়ে গেলেন তেরকেলে বোধ হয়, অজানার আতঙ্ক। সঙ্গে সঙ্গেই অন্য ছিদ্রে ঢুকিয়ে দিলেন দ্বিতীয় কাঠিটা। সেটাতেও চাড় একটু। তাকিয়ে দেখেন—ল্যাবরেটরিতে নিজের জায়গাটিতেই বসে আছেন কালচক্রে সওয়ার হয়ে। কোথাও কিছু বদলায় নি। এক মুহূর্তের মধ্যে বদলাবেই বা কী?

কিন্তু ওকি? ঘড়িতে দশটা বাজতে এক মিনিট দেখে তিনি কালচক্রের জিনে চড়েছিলেন না? এ তবে কী? ঘড়ি যে এখন বলছে সাড়ে তিনটে! দিশেহারা হয়ে তিনি প্রথম কাঠির চাড় দিলেন আবার।

ধপ্ করে একটা আওয়াজ! কোথায় আওয়াজ হল, কিসে হল, ঠাহর পেলেন না তেরকেলে। কিন্তু আওয়াজটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদম্য গতিবেগের সঞ্চার হল যেন তাঁর কালচক্রে। দুর্বার বেগে তিনি যেন ছুটে চলেছেন কোথায়। ঘর-করুনী মিসেস ওয়াচেট দরজা খুলে ঘরে ঢুকছেন, হেঁটে চলেছেন বাগানের দিকের জানালার কাছে। ঘরটা লম্বা, মিনিট-খানেক লাগতে পারে জানালায় পৌঁছুতে, কিন্তু তেরকেলে যেন দেখলেন—মোটাসোটা ভদ্রমহিলাটি মেজেটা পেরিয়ে যাচ্ছেন হাউইয়ের মত ক্ষিপ্রবেগে।

বিজ্ঞানী ছুটেই চলেছেন? না, ঠায় বসে আছেন ল্যাবরেটরিতে? বুঝবার জো নেই। ওদিকে খেয়াল করবার, ও-বিষয়টা বিচার করবার ফুরসুত নেই তেরকেলের। চোখের সমুখে দিনের আলো নিবে এল, রাত্রি এল রাশি রাশি আঁধার নিয়ে, দেখতে দেখতে সে-রাত্রিও ভোর। তারপরে আবার রাত্রি, আবার প্রভাত, পালটা-পালটি, শ্বাস ফেলবার সময় নেই। কানের ভিতর ক্রুদ্ধ অস্ফুট গুঞ্জন বাসা বেঁধেছে একটা,

... স্তিমিত কল্লোলে একটা ভয়াল ঘূর্ণি পাতালে সেঁধিয়ে যাচ্ছে তাল-প্রমাণ জলকে ...কোলায় জাপটে ধরে।

সে-অনুভূতি বিশ্লেষণ করা অসাধ্য। এইটুকু কেবল মনে হচ্ছিল যে স্বস্তি পাচ্ছেন ... তেরকেলে, এক মুহূর্তের জন্য নয়। এই বুঝি পড়ে যাই, এই বুঝি হাড়-গোড়-ভাঙ্গা ... যাই, এমনি একটা সর্বগ্রাসী আতঙ্ক। ছুটছেন, না বসে আছেন স্থাণুবৎ? না ... এই দুরন্ত কাঁপুনি কেন? এই পলকে পলকে দৃশ্যান্তর ঘটে কেন?

একবার আলো, একবার অন্ধকার, দৃষ্টিকে পীড়িত করে তুলছে মুহুর্মুহুঃ। রাত্রি ... বাদুড়ের মত কালো পাখায় দশ দিক্ আচ্ছন্ন করে, তারপরই জ্বলন্ত সূর্য লম্ফে ... অতিক্রম করে যাচ্ছে মহাশূন্য কান্তার। সেই লাফের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদটাকে দেখা ... এক একবার, এই প্রতিপদের ক্ষীণ রেখা একটুখানি, তার পরেই পূর্ণিমার ...র্ময় চন্দ্রগোলক!

গতিবেগ আরও যেন দ্রুততর! দিবারাত্রির আগম নিগম একসাথে মিলে মিশে ... যেন, বিরতিবিহীন এক ধূসরতা সর্বত্র। তাও আবার ফেটে যায় ঐ, আকাশে ... নীলিমা, ছুটন্ত মার্তণ্ড যেন একটা দীর্ঘায়িত বহ্নিরেখা। তার শেষ প্রান্তে শশী সূর্য ...র সমগ্র দ্যুতিকে নিবিয়ে ডুবিয়ে দেওয়ার মত জাজ্বল্যমান সুমহান্ এক ...-জোড়া আলোক-তোরণ।

তারই আলোকে আশে-পাশে মাটির পৃথিবী চোখে পড়ছে এইবার। সবই যেন ... ঢাকা, অস্পষ্ট। পায়ের নীচে একটা পাহাড়ের সানুদেশ যেন। এটা কি সেই ... নাকি, যার উপরে তেরকেলে বিজ্ঞানীর বাড়ি ছিল একদিন? গাছপালা সব ... কিম্ভূতকিমাকার কেন তাহলে? রং তাদের এই সবুজ, এই বাদামী। এই তারা ...-প্রশাখ মেলে ছড়িয়ে পড়ছে দিগদিগন্তে, এই আবার কুঁকড়ে শুকিয়ে ঢলে পড়ছে ...র বুকে।

ভূপৃষ্ঠও কি পালটে যাচ্ছে নাকি? শক্ত মাটি গলে গলে ধারায় বয়ে যাচ্ছে দূর ... সূরবলয়? ও কি মিনিটে মিনিটে পাড়ি দিচ্ছে ক্রান্তি থেকে ক্রান্তিতে? তার ... এই দাঁড়ায় যে এক মিনিটে এক বছরের কালান্তরে পৌঁছে যাচ্ছে কালচক্র?

বরফ! বরফ! তুষারঝঞ্ঝা! সারা পৃথিবী আচ্ছন্ন করে তুষার জমে গেল ... ঐ আবার গলেও যাচ্ছে সে-তুষার, বসন্তের উজ্জ্বল শ্যামলিমায় আবৃত হয়ে ... মাটির বুক

এই বুঝি তবে ভবিষ্যের পৃথিবী—

কৌতূহল আতঙ্কে মিলে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি জুড়ে বসছে বিজ্ঞানীর মস্তিষ্কে।

এই ভাবীকালের পৃথিবীতে মানুষের কী অবস্থা? তার সভ্যতার কীদৃশ পরিণতি? জীবজন্তু উদ্ভিদের কতখানি রূপান্তর বা বিবর্তন? পৃথিবী ধেয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে, ছায়া-ছবির পর্দায় নতুন নতুন চেহারা পলকের জন্য দেখা দিয়ে পলকেই মিলিয়ে যাচ্ছে আবার চোখের আড়ালে! এভাবে ছুটে লাভ কী? কোন-কিছুর সম্বন্ধেই জানা তো যাচ্ছে না কিছুই! জানতে হলে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় এক জায়গায়, গভীরভাবে মনসংযোগ করতে হয় পরিবেশের উপরে, তবে তো জ্ঞানার্জনের সুযোগ আসবে।

দাঁড়িয়ে পড়া। জিনিসটা নিরাপদ নয়। কালচক্র গড়ে তুলবার সময়েই কথাটা মনে হয়েছিল ত্রিকালপন্থীর। চলার জন্য যে-যন্ত্রের উদ্ভাবন, তাকে থামাতে গেলে হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। চক্র হতে পারে চুরমার, চক্রের সওয়ার গুঁড়িয়ে গিয়ে রেণু রেণু হয়ে মিশে যেতে পারে ধরার ধুলোর কণায় কণায়।

নিশ্চয়ই। গুরুতর আশঙ্কাই আছে। কথাটা গোড়াতেই মনে হয়েছিল। তখন ভেবেছিলেন—যন্ত্রটা আগে গড়ে উঠুক, তার পরে ও গলদ শোধরাবার একটা উপায় বার করা যাবে। কিন্তু যন্ত্র শেষ হয়ে গেল যখন, মনের আনন্দে ঐ প্রয়োজনীয় কথাটা বেমালুম ভুল হয়ে গেল বিজ্ঞানীর, কালবিলম্ব না করে তিনি চড়ে বসলেন কালচক্রে।

এখন? আবহমান কাল তিনি ছুটতেই থাকবেন নাকি তাহলে?

তা তো আর হয় না! নামতে হবেই একদিন। আর হবেই যখন, এখনই হয়ে যাক না! পৌঁছানো গিয়েছে খ্রীষ্ট-তিরোধানের একশো শতাব্দী পরে, এবার একবার থামা যাক। যদি এই থামাতেই পরমায়ু শেষ না হয়ে যায়, মূল্যবান অভিজ্ঞতা অনেকখানি লাভ হবে।

যাত্রা শুরুর কাঠিটা ছিদ্রপথে ঢুকিয়েই রেখেছিলেন সেটাকে বিজ্ঞানী হেঁচড়ে টেনে বার করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে কালচক্র বন বন করে ঘুরপাক খেলো কয়েকবার, মাতালের মত টলতে লাগল তারপরে। আর বিজ্ঞানী ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে পড়লেন কয়েক ফুট তফাতে।

বাজ-পড়ার মত একটা আওয়াজ কানে এল বিজ্ঞানীর, চেতনাই বোধ হয় হারিয়ে ফেললেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। জ্ঞান যখন ফিরে এল, নরম ঘাসের উপর তিনি বসে আছেন, শিলাবৃষ্টি মাথায় করে। কালচক্র উলটে পড়ে আছে সমুখে। আকাশ পৃথিবী ধূসর বর্ণ, কিন্তু কানের ভিতর সেই ঘূর্ণীর মৃদুকল্লোলটা আর নেই। বিজ্ঞানী চারদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করছেন বসে বসে।

বাগানের ভিতর ঘাসে-ঢাকা একটুখানি সবুজ মাঠ। রডোডেনড্রনের ঝোপে ঝোপে ঘেরা। শিলাবৃষ্টিতে লাল আর বেগুনে ফুল রাশি রাশি ঝরে পড়েছে প্রতি ঝোপের নীচে। শিলাগুলো কালচক্রকে ঘিরে ঘিরে নৃত্য করছে। মাটিতে পড়েই ছিটকে যাচ্ছে চারিদিকে।

ছোট একখানা দুধ-সাদা মেঘ যেন রচনা করেছে যন্ত্রটাকে বেষ্টন করে। বিজ্ঞানী ওদিকে ভিজে সপসপ করছেন চামড়া পর্যন্ত—"চমৎকার আতিথ্য তোমাদের" —চারদিকের ভূপ্রকৃতিকে সম্বোধন করে তিক্তস্বরে বলে উঠলেন তেরকেলে—"যে লোক হাজার হাজার বছর ডিঙ্গিয়ে দেখতে এল তোমাদের, তার জন্য অভ্যর্থনাটির আয়োজন করেছ ভারী সুন্দর!"

কিন্তু বসে বসে ভেজা তো বোকামি ছাড়া কিছু নয়! বিজ্ঞানী উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিক লক্ষ্য করতে লাগলেন আশ্রয়ের সন্ধানে। শিলাবৃষ্টির দরুন চারিদিক ঝাপসা। তবু রডোডেনড্রনগুলোর পিছনে কী যেন একটা বিরাট ইমারত অস্পষ্ট-ভাবে চোখে পড়ে—কোন একরকম সাদা পাথরে যেন তা গড়া। দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত অন্য কিছুই নেই কোনদিকে।

একজন সোজা ছুটে এল বিজ্ঞানীর দিকে। [পৃষ্ঠা ৮০৮

শিলাবৃষ্টি মাথায় করেই ঐ সাদা ইমারতের দিকে অগ্রসর হলেন তেরকেলে। সাদা জিনিসটা কোন বাড়ি বা মন্দির নয়, ব্রোঞ্জের বেদীর উপরে মর্মরে গড়া প্রকাণ্ড একটা ডানাওয়ালা স্ফিংক্‌স্‌। ডানা দুটো ছড়ানো থাকার দরুন মনে হয়, এক্ষুণি বুঝি উড়ে চলে যাবে বেদী ছেড়ে।

তেরকেলে বিজ্ঞানী কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন ঐ মূর্তির দিকে তাকিয়ে? আধমিনিট, না আধঘণ্টা? যতক্ষণই হোক, হুঁশ হতেই দেখলেন শিলাবৃষ্টি থেমে আসছে। দূরে দূরে আরও অনেক অনেক আকাশচুম্বী অট্টালিকা ভেসে উঠছে চোখের উপর, তাদের পিছনে অরণ্যে ঢাকা একটা ঢালু গিরি সানুদেশ। হঠাৎই কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল বিজ্ঞানীর, তাড়াতাড়ি কালচক্রটাকে খাড়া করে তুলবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পালানোই ভাল।

ওদিকে সূর্য দেখা দিয়েছে আকাশে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের টুকরো ভেসে চলে যাচ্ছে

দিগন্তের কোলে। বড় বড় বাড়িগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এইবার। তাদের গায়ে গায়ে কারুকার্যের বাহার যথেষ্ট, কিন্তু কেমন যেন নিষ্প্রভ, বেমেরামত, ভেঙে-পড়ার-মত চেহারা সেই ভয়-ভয় ভাবটা চেপে বসছে বিজ্ঞানীর মনে। এক অচেনা জগতে তিনি যেন একা. অসহায়। এর কবল থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্য তিনি যন্ত্রটাকে নাড়া দিলেন প্রাণপণে আর তাতেই ওটা ঘুরে এসে আঘাত করল তাঁর চিবুকে। কেটে গেল অনেকখানি।

তা যাক, যন্ত্রটা দুরস্ত হয়েছে আবার। এক হাত জিনে রেখে আর এক হাতে কাঠি নিয়ে বিজ্ঞানী লাফিয়ে উঠবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ওঠা আর হল না। সবচেয়ে নিকটের বাড়িটার দোতলায়, একটা খোলা গোল বারান্দায় একদল লোক দেখা গেল। পরনে তাদের কী একরকম দামী মোলায়েম পোশাক। তারাও বিজ্ঞানীকে দেখেছে, ভাল করেই দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে।

বিজ্ঞানীর দৃষ্টিও ওদিকেই। কিন্তু আশে-পাশেও মানুষের আওয়াজ পাওয়া যায় যে! স্ফিংক্সের কাছাকাছি ফুলগাছের ঝাড় বেড় দিয়ে দিয়ে অনেক লোক দৌড়ে আসছে। ওদের ভিতর একজন সোজা এল বিজ্ঞানীর দিকে। হালকা ছোট্ট চেহারার মানুষটি। চার ফুটের বেশী হবে না মাথায়। বেগুনে রং ঢোলা রেশমী পোশাক তার, কোমরে চামড়ার বেল্ট দিয়ে আটকানো। পায়ে চপ্পল, হাঁটু পর্যন্ত অনাবৃত, মাথাতেও নেই কোন আচ্ছাদন। ওদের ঐ রকম বাহুল্যবর্জিত বসন দেখেই বিজ্ঞানীর প্রথম খেয়াল হল যে স্থানটার আবহাওয়া গরম।

কী সুন্দর চেহারা ওর! কী অনিন্দ্য সৌষ্ঠব! কিন্তু স্বাস্থ্য যেন অতি পলকা। মুখে একটা লালচে আভা, যেটা সাধারণতঃ ক্ষয়রোগীর মুখে দেখা যেত আগের দিনে। এ চেহারার মানুষকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তা তাদের সংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন। কালচক্র থেকে হাত নামিয়ে সেই হাত এই অচেনা জগতের অধিবাসীর দিকে এগিয়ে দিলেন বিজ্ঞানী। আরও লোক এসে পড়েছে দলে দলে। তারা ঘিরে ধরেছে ওঁকে, অবাক্ হয়ে দেখছে শুধু। ভয়ডরের কোন আভাস নেই তাদের ব্যবহারে, নেই বিরক্তির বা বিতৃষ্ণার কোন চিহ্ন। গায়ে-পড়া হয়ে বিজ্ঞানীকে তারা ঠেলতে ঠেলতেই নিয়ে চলল তাদের বাড়ির দিকে। কালচক্র পড়ে রইল স্ফিংক্স-এর পাশে। থাকুক না, কে নেবে।

বাড়িটাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হল ঘর। চমৎকার সাজানো, রাজপ্রাসাদের মতই। কিন্তু সবই যেন অতি-সেকেলে, জীর্ণ, শ্রীহীন। আসবাবপত্র ভেঙ্গেছেও একটু আধটু। তা ভাঙ্গুক, ভাঙ্গা চেয়ারে বসে ভাঙ্গা টেবিলেও দিব্যি খাওয়া যায়, পেটে যদি ক্ষিধে থাকে, আর খাদ্য যদি উপাদেয় হয়।”

রাশি রাশি ফল টেবিলে। নানা রকমের সুপক্ক রসাল ফল। কোনটাই ঠিক

পরিচিত নয় বিজ্ঞানীর। না-হওয়ারই কথা তো! হাজার হাজার বছরের বিবর্তন তো ফলের উপরেও চিহ্ন রেখে যাবে। মানুষগুলো যদি ছয় ফুট থেকে চার ফুটে নেমে থাকে, ফলগুলো ছয় ইঞ্চি থেকে দেড় ফুটে উঠতে বা চার ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চিতে নামতে পারবে না কেন?

আকার যেমনই হোক, ফলগুলি খেতে অতি মিষ্টি। বিজ্ঞানী পেট ভরেই খেলো। আশ্চর্য! এরা কি ফল খেয়েই বাঁচে? সন্ধ্যা আসন্ন, সেকালে সান্ধ্যভোজই ছিল সারাদিনের সবচেয়ে বড় ভোজ। সম্ভবতঃ সে-রীতি পালটায় নি। তাহলে এর মানে কী? ফল খেয়েই ডিনার সমাধা করল এরা?

খাওয়ার পরে ওরা বাইরে গিয়ে নাচ শুরু করল। ফুলের কেয়ারিতে ঘেরা সবুজ লন আনন্দ-কলরবে হয়ে উঠল মুখর। বিজ্ঞানীর সম্বন্ধে ওদের কৌতূহল নিবে গিয়েছে এর মধ্যেই। ওঁর দিকে কেউ আর নজরই দিচ্ছে না। কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবার বা কৌতূহলকে অনুসন্ধিৎসার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যম আর অভ্যাস এদের মধ্যে যেন নেই। বিজ্ঞানী অবাক্ হয়ে ভাবেন—কালচক্রের আবর্তনে মানবজাতির কি উন্নতি না হয়ে অধঃপতন হল? এদের তো মানুষ বলে ধারণা করাই শক্ত! সারি সারি মোমের পুতুল যেন হাত ধরাধরি করে নাচছে পুতুল নাচের আসরে।

বিরক্ত হয়ে বিজ্ঞানী এগিয়ে গেলেন চারি দিক্‌টা ঘুরে ফিরে দেখবার জন্য। দিনের আলো তখনও আছে খানিকটা। যতটা যা পারা যায়, এরই মধ্যে দেখে নিয়ে তিনি তাঁর মেসিনে উঠে বসলেন। আশা করা যাক তাঁর নিজের বাড়ির ডিনার-টেবিলে বন্ধুরা তখনও উপস্থিত থাকবেন, তাঁর ফিরে যাওয়ার প্রতীক্ষায়।

অদূরে একটা বিরাট বাড়ি, পাহাড়ের গায়ে। যেমন লম্বা চওড়া, উঁচুও তেমনি। ছয়তলা আটতলা হবে অন্ততঃ। অন্য সব বাড়ির চাইতে বেশী ভাঙ্গাও যেন। ওটা কী, তা দেখতে হবে। সেই দিকেই পা বাড়িয়ে দিলেন বিজ্ঞানী।

চলে যাচ্ছেন স্ফিংকস-এর পাশ দিয়ে। হঠাৎ বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। কালচক্র কই? কালচক্র? নেই তো! নেই! নেই!

এদিকে ওদিকে, ঝোপঝাড় তন্ন তন্ন করে লক্ষ্য করছেন বিজ্ঞানী, কোথাও কোন চিহ্ন নেই যন্ত্রটার। বেমালুম উবে গিয়েছে একেবারে। কে নিয়ে গেল? বিজ্ঞানীকে নৈরাশ্যের নরকে ডুবিয়ে দিয়ে তাঁর বৈতরণীর খেয়া কে অপহরণ করল? ঐ যন্ত্রটি না পেলে তো এইখানেই তাঁর চির নির্বাসন! দশ হাজার বৎসর পরের এই অধঃপতিত পরিবেশে! নিজের দেশে, নিজের যুগে, নিজের মত মানুষদের সান্নিধ্যে ফিরে যাবার তো কোন পথই নেই তাঁর! কে চুরি করল তাঁর যন্ত্র? ঐ নাচিয়ে গাইয়ে সজীব পুতুলেরা ছাড়া আবার কে?

বিজ্ঞানী ধেয়ে গেলেন তাদের দিকে মার-মূর্তি হয়ে—"আমার মেসিন কই? কালচক্র? কী করেছ সেটা তোমরা?"

তাঁর ক্রুদ্ধ মূর্তি আর তর্জনগর্জন একেবারে যেন ত্রস্ত করে তুলল এই পুতুলের মত মানুষগুলোকে। এক মুহূর্ত তারা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে, তারপরে দুদ্দুড় করে ছুটে পালাতে লাগল বাড়ির দিকে। বিজ্ঞানী আর অনুসরণ করলেন না তাদের। নিজের এই অসংযমের জন্য তিনি এখন লজ্জাই বোধ করছেন। এরা যে এই অপকর্মটি করে নি, এ বিশ্বাসও হচ্ছে একটু একটু করে। কখন তারা করল? তারা তো ফলাহারেই ব্যস্ত ছিল বিজ্ঞানীকে নিয়েই। কখন তারা অত-বড় ভারী মেসিনটাকে সরিয়ে ফেলল? সরিয়ে ফেলবার শক্তিই বা পেল কোথায়? ওরা সব-কয়টি পুতুল একত্র হয়েও তো কালচক্রকে তুলে নিয়ে যেতে পারবে না!

বিজ্ঞানী ফিরে এসে আবার স্ফিংকস্-এর আশেপাশে ঘুরতে থাকলেন। নরম মাটিতে অনেকগুলো পায়ের দাগ দেখা যায় যেন। খালি পায়ের দাগ। কিন্তু ঐ পুতুলদের পায়ে তো চপ্পল রয়েছে। এই নগ্নপদ মানুষ তা হলে এল কোথা থেকে? এ-যাবৎ তো এমন একটিও মানুষ চোখে পড়ে নি, যার পায়ে চপ্পল নেই! সমস্যা! এরা ছাড়াও অন্য মানুষ এখানে আছে নাকি?

পায়ের দাগগুলো সবই শেষ হয়েছে ঐ স্ফিংকস্-এর বেদীর কাছে। বেদীটা বিজ্ঞানীরও মাথার উপরে আরও অনেকটা উঁচু। ব্রোঞ্জের একটা ঘর যেন, অনেকটা জায়গা জুড়ে। চারদিকের দেয়াল খোপে খোপে ভাগ করা। বিজ্ঞানীর সন্দেহ হল—ঐ খোপ-গুলির কোন একটাতে হয়ত গোপন দরজা আছে, সেই দরজা খুলে তস্করেরা কালচক্রকে হয়তো বেদীর জঠরে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

সে-দরজা আবিষ্কার করা এবং তারপরে সেটা খুলে বা ভেঙে ফেলা—এই হল বিজ্ঞানীর প্রথম কাজ এখন।

ভাঙ্গা? কী দিয়ে ভাঙ্গা যাবে? কুড়োল নেই, মুগুর নেই, এ যুগে পৃথিবীতে ওসব জিনিসের ব্যবহারই নেই, মনে হচ্ছে। লোহার বা কাঠের একটা মোটা ডাণ্ডা দিয়ে ঘা দিতে পারলে বেদীর দেয়াল ভেঙে পড়তে পারে বই কি! বিশেষ মজবুত বলে তো মনে হয় না ঐ ব্রোঞ্জের পাত।

কোথায় পাওয়া যায়? অদূরের ঐ ছয়তলা ভাঙ্গা বাড়িটার দিকেই দৌড়োলেন বিজ্ঞানী। অনেক কালের পুরোনো মনে হয় ওটাকে। যে-যুগে তৈরী হয়েছিল, হয় তো তখনও ডাণ্ডা মুগুর কুড়োল-শাবলের ব্যবহার ছিল পৃথিবীতে!

বিজ্ঞানী যখন রওনা হলেন ঐ বহু-তলা বাড়িটার উদ্দেশে, তখনও বেলা কিছু আছে।

মনে হল, সন্ধ্যার আগেই তিনি ফিরে আসতে পারবেন, কাজ সেরে। ফিরে আসা তো দরকার! তাঁর প্রাণভোমরা যে পড়ে আছে ঐ স্ফিংকস্-এর বেদীর ভিতরে। কালচক্র উদ্ধার করতে না পারলে তো তিনি চিরবন্দী এই সুদূর ভবিষ্যের যুগে।

হ্যাঁ, মনে হয়েছিল যে বাড়িটা খুব বেশী দূরে নয়। কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটবার পরেই ভুল ভাঙ্গল বিজ্ঞানীর। বেশ দূর আছে ওটা, গিয়ে দেখে শুনে ফিরে আসতে রাত এক প্রহর হয়ে যাবে। অচেনা স্থান, আকাশে চাঁদ উঠবে কিনা, কে জানে।

তারা দুই হাতে চোখে ঢেকে পিছু হটছে। [পৃষ্ঠা ৮১৩

কিন্তু, রওনা যখন হয়েই পড়েছেন, আর ডাণ্ডা-মুগুর যা হোক একটা কিছু নেহাতই চাই যখন, নিবৃত্ত হয়ে ফিরে আসার প্রশ্নই তো ওঠে না! যথাসম্ভব পা চালিয়ে এগিয়ে চললেন বিজ্ঞানী। একটা নীচু পাহাড়ের মাথায় বাড়িটা, ওপাশে সমুদ্র দেখা যায়। জায়গাটা যেন তাঁর খুবই পরিচিত, অবশ্য বাড়িটা নয়। হয়তো তাঁর যুগের অনেক অনেক পরে ওটা তৈরী।

নীচের তলায় ঢুকেই পরিচয় পেয়ে গেলেন যে কী ছিল বাড়িটা। মিউজিয়াম। বিরাট বিরাট হল আর দীর্ঘ দীর্ঘ গ্যালারি। এক একটা ঘরে এক একটা বিভাগ। বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার জন্য নির্দিষ্ট আলাদা আলাদা মহল! পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা—বাদ নেই কিছু। তা ছাড়া নৃতত্ত্ব বিভাগ, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, এ সবের জন্য স্বতন্ত্র সংরক্ষিত স্থান। সবই ভগ্ন জীর্ণ অবশ্য। অধিকাংশই এমন অবস্থায় পৌঁছেছে, বোঝাই যায় না যে জিনিসটা কি ছিল।

সময় থাকলে এই মিউজিয়ামের ভগ্নাবশেষ দেখে দেখেই ছয় মাস কাটিয়ে দিতে পারতেন

বিজ্ঞানী। এত বড়, এমন বহু বিচিত্র সংগ্রহশালা একদা ছিল সেখানে। কিন্তু সময় তাঁর নেই। তিনি যার জন্য এসেছেন, তাই খুঁজে ফিরছেন ঘরে ঘরে। অবশেষে তা পাওয়া গেল। একটা ঘরে শুধু কঙ্কালসার লৌহযন্ত্র সারি সারি সাজানো। তারই একটাতে ঝুলতে দেখা গেল ভারী এক লৌহদণ্ড। দণ্ডটা খুবই মজবুত রয়েছে, কিন্তু যে নাট-বোল্টু দিয়ে তা এক সময়ে সংলগ্ন ছিল মূলযন্ত্রের গায়ে সেইটে গিয়েছে ক্ষয়ে। জোরে একটা টান দিতেই ডাণ্ডাটা খুলে চলে এল বিজ্ঞানীর হাতে।

কার্যসিদ্ধি! আর কী নেওয়া যায়? আর কী পাওয়া যায় হাতের মাথায়? একটা বায়ুশূন্য কাচের আধারে দেখতে পেলেন মস্ত এক তাল কর্পূর। আশ্চর্য! যে কর্পূর দেখতে দেখতে উবে যায় চোখের সামনে, তাই টিকে রয়েছে যুগ যুগান্ত অতিক্রম করে? আস্ত? অবিকৃত? কৌতূহলের বশেই কাচের জার সমেত কর্পূরটা ঝাড়নে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন বিজ্ঞানী, সমুখে যে দরজা দেখতে পেলেন, তাই দিয়েই। খানিকটা দূর চলে আসবার পরেই ঘটল মারাত্মক দুর্ঘটনা। পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে গেল। বিজ্ঞানী পড়ে গেলেন এক সুগভীর কূপে।

কূপের উপরটা সেকালে লোহার পাত দিয়ে ঢাকা ছিল। সেটা স্বভাবতঃই জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তার উপরে জমেছে ধুলোর পুরু আস্তরণ। সেই ধুলোর উপরে পা ফেলা মাত্রই নীচের লোহার পাত গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে একেবারে।

বিজ্ঞানী পড়লেন নরম বালিতে। অন্ধকার নিবিড়, কিন্তু আশে-পাশে কথা শোনা যায়। স্ফিংকসের কাছাকাছি যে সব চার ফুট মানুষ দেখতে পেয়েছিলেন, তাদেরই কথার মতন কথা। পকেটে দেশলাই রয়েছে, তারই একটা কাঠি জ্বেলে ফেললেন বিজ্ঞানী।

কূপের তলাতে তিনি বসে আছেন, তাঁর চারদিকে চার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে চার সুড়ঙ্গ। কথা শোনা যায় সেই সব সুড়ঙ্গের ভিতরই। দেশলাই কাঠিটা হাতে নিয়ে বিজ্ঞানী একটা সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে চললেন। মানুষ যখন আছে, তখন আর ভয় কী? এখনকার মানুষ তো খারাপ নয়!

সুড়ঙ্গ আর সুড়ঙ্গ নেই, ক্রমে প্রশস্ত হতে হতে একটা চত্বরের আকার নিয়েছে। সেই চত্বরে বিশাল বিশাল যন্ত্রপাতি, তাতে নানারকম কাজ করছে উপরের মানুষের মতই দলে দলে বামন; কিন্তু বেঁটে আকার ছাড়া উপরের ওদের সঙ্গে নীচের এদের আর কোন সাদৃশ্যই নেই।

দেশলাই কাঠি নিবে এসেছিল, আর একটা জ্বেলে ফেললেন বিজ্ঞানী। তারপর আর একটা ব্যাপার দেখে তিনি অবাক্ হচ্ছেন, মানুষগুলো অন্ধকারে দিব্যি কাজ করছিল,

এখন আলো দেখে তারা দুই হাতে চোখ ঢেকে পিছু হটছে। মুখে কাতর আর্তনাদ। এরা আঁধারের জীব না কি? আলো সহ্য করতে পারে না?

লোকগুলোর গায়ে লম্বা সাদা লোম, তেকোনা মুখে চিবুক বলে কোন জিনিস নেই, চোখ বলতে যা আছে, তা শুধু একটা চিড়মাত্র, তার উপর নীচে পাতা নেই মোটে। সোজা হয়ে হাঁটতে তারা পারে না, এমন কুঁজো হচ্ছে ছুটে পালাবার সময় যে মনে হয় বুঝি বা চার হাত পায়ে হাঁটছে চতুষ্পদের মত।

আলো এরা সইতে পারে না, বিজ্ঞানীর এই অনুমান। তা হলে দেখা যাক না, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে এরা কী রকম ব্যবহার করে। এবারে যখন দেশলাইয়ের কাঠি নিবল বিজ্ঞানী আর আলো জ্বাললেন না।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আশে পাশে নিঃশ্বাসের শব্দ। দুর্বোধ্য ভাষায় চাপা গলার ফিসফিসানি। বিজ্ঞানীর গায়ে ঠাণ্ডা লোমশ হাতের স্পর্শ। কী জানি কেন, গা ঘিনঘিন করে উঠল বিজ্ঞানীর। তবু তিনি ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময়ে শিউরে উঠলেন গলায় ধারালো দাঁতের কামড় লেগে। এরা হিংস্র?

বগলে লোহার ডাণ্ডাটা ছিলই। সেইটা বাগিয়ে ধরে আঁধারের ভিতরই এলোপাতালি পিটোতে লাগলেন বিজ্ঞানী। মিহি গলার বহু আর্তনাদে পাতালের অন্ধকার বিদীর্ণ হয়ে গেল অমনি। তাড়াতাড়ি আবার আলো জ্বালতেই বিজ্ঞানী দেখলেন—কুঁজো হতে হতে দৌড়ে পালাচ্ছে তাঁর আততায়ীরা।

আলো হাতে নিয়ে আরও কিছু দূর এগিয়ে গেলেন, না গিয়ে করবেন কী? একটা নিরাপদ আশ্রয় তো চাই রাত কাটাবার জন্য? ঘুরতে ঘুরতে একসময় কিন্তু তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হল ভয়ে বিস্ময়ে। একখানা টেবিলের উপরে নরদেহ একটা। চার ফুট পরিমাণ লম্বা। নীচের অঙ্গে রেশমী পোশাক পরাই আছে এখনও। উপরের অঙ্গ থেকে খাবলা-খাবলা মাংস যেন এইমাত্র ছিঁড়ে খাচ্ছিল কোন হিংস্র জন্তু। হুঁ, তা হলে নীচের এরা স্রেফ ফলাহারী নয়।

সেখান থেকে দূরে সরে গিয়ে বিজ্ঞানী বসে পড়েছেন। ঝোলা থেকে কর্পূরের তাল বার করে তাই পোড়াচ্ছেন ক্রমাগত। আলো নিবতে দিলেই এই পাতালবাসী নরখাদকদের হাতে প্রাণ যাবে। বসে বসে ভাবছেন। কালচক্রের আবর্তনে মানবজাতির এ কী অধোগতি! যারা ছিল ধনী, বিলাসী, শ্রমবিমুখ, তারা পরিণত হয়েছে উপর পৃথিবীর ঐ ফলাহারী জাতিতে। আর যারা ছিল শ্রমজীবী, দারিদ্র্যে নিপীড়িত, তারা মানুষের সংস্কার হারিয়ে নেমে গিয়েছে পশুর পর্যায়ে, বাস করে আঁধারে, ভোজন করে নরমাংস। মাংস অবশ্য ঐ উপরতলার মানুষদেরই। হয়তো একটা বিনিময়ের বন্দোবস্ত আছে উপরে ও নীচে;

নীচুওয়ালারা পোশাক তৈরি করে দেয় উপরওয়ালাদের, আর উপরওয়ালারা ওদের দেয় দেহমাংস। সেটা মৃতদেহের, না জ্যান্তদেহের, তা অবশ্য বোঝা যায় না।

ঐখানে কর্পূরের আগুনের সম্মুখে বসে থাকতে থাকতে এক সময় বিজ্ঞানী দেখলেন—নিকটেই একটা জায়গায় একটু একটু আলো আসছে উপর থেকে। উঠে গিয়ে দেখলেন এ আর একটা কূপ, চোঙের মত উঠে গিয়েছে ওপর পানে। এর গায়ে মাঝে মাঝে আংটাও লাগানো আছে ওঠানামা করার জন্য। উপর পৃথিবীর সঙ্গে এই পাতাল রাজ্যের এইগুলিই যোগাযোগের পথ। বিজ্ঞানী আংটা ধরে ধরে উঠে গেলেন উপরে, উঠেই দেখেন সমুখেই তাঁর কালচক্র। এই কূপটা নেমে গিয়েছে স্ফিংক্স্-এর বেদীর ভিতর থেকে। ভগবান স্মরণ করে বিজ্ঞানী উঠে বসলেন কালচক্রে, কাঠি চালিয়ে দিয়ে ছুটে চললেন নিজের যুগে।

যখন সেখানে পৌঁছালেন, বন্ধুরা তখনও ডিনার শেষ করতে পারেন নি, তাঁদের ডেকে বিজ্ঞানী বললেন—"আমার জন্যে কিছু রেখেছ তো? উঠো না, আমি স্নানটা সেরে এখনই আসছি। খেতে খেতে গল্প শোনাব তোমাদের।"

কলিকাতার পাইকপাড়া অঞ্চল হইতে শ্রীগৌরচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর স্বর্গগত পুত্র বাসুদেব ভট্টাচার্যের পুণ্যস্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺বাসুদেব ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ঃ

ছাত্রজীবনের কর্তব্য

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ঃ মাঘ সংক্রান্তি। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী বৈশাখ সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশিত হবে।

জন্ম ঃ সন ১৩৫৯ ২৩শে পৌষ
(ইং ৯ই জানুয়ারী ১৯৫৩)
মৃত্যু ঃ সন ১৩৭৯ ৯ই আষাঢ়
(ইং ২৩শে জুন ১৯৭২)

প্রথম পুরস্কার ১৫·০০ টাকা ● দ্বিতীয় পুরস্কার ১০·০০ টাকা

ভয় নেই জয়ন্ত — ভয় পাবেন না প্রফেসর ... যথাস্থানে পৌঁছে চোখ খুলে দেব...
তীর বেগে ছুটে চলল উড়ার গাড়ি...
তোমার চোখ খুলে দিলাম। তোমার বাবার চোখ তুমি নিজেই খুলে দাও জয়ন্ত, তারপর সোজা বাড়ী চলে যাও...
ধন্যবাদ উড়া!
আমাদের বাড়ীর সামনে নামিয়ে দিয়ে উড়া গাড়ি নিয়ে চলে গেল... এখন আর ভাবনা নেই।
ভাবনার কি শেষ আছে জয়ন্ত!
ভাবনার কি শেষ আছে? উড়া ফিরে গেল বটে কিন্তু রবালা আর তার গুপ্তচর বিভাগ কি উড়ার সিদ্ধান্ত মেনে নেবে?
সেকি! বাবা! তুমি বলতে চাও ঐ ভুতুড়ে জীবগুলি আবার হানা দেবে?
আমি এখন কিছু বলতে চাই না — শুধু একটু ঘুমাতে চাই ... তাড়াতাড়ি চলো জয়ন্ত।

(শেষ)

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

মাটিতে গোলাকৃত আগুন লকলক করে জ্বলে উঠেছে। মাঝের জমিতে হঠাৎ নীলাঞ্জী ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুনের বেড় ভেদ করে। তারপর সে কি উন্মত্ত নৃত্য! নিজেকে যেন কার কাছে বিলিয়ে দিতে চায়⋯এমনি ভঙ্গীতে একবার করে চারপাশের আগুনকে আর আকাশের চাঁদকে জানাতে চায়।

চারদিকের নাচের হুল্লোড় এবার যেন শতগুণ বেড়ে উঠলো।

আগুনের গোলক পরিধির মাঝখানে নীলাঞ্জীর করুণ আবেদন সংগীতে উঠলো⋯যেন এক বুকফাটা আর্তনাদ।

সারা সংগীত-উল্লাস হঠাৎ থেমে গিয়ে নিশ্চুপ হয়েছে। আর তারই মধ্যে নীলাঞ্জীর এই হৃদয়বিদারক সুর যেন সারা বনানীর দরজায় দরজায় আক্ষেপে মাথা খুঁড়তে থাকে।

হঠাৎ আবার আগের উল্লাস যেন প্রকটিত হয়ে শতগুণ দ্রুত হয়ে উঠলো। নীলাঞ্জী অগ্নি-পরিধি থেকে এক লাফে আগুন ভেদ করে বেরিয়ে এলো⋯

সামনেই বুশমেনদের হাতে হাতে ধরা প্রকাণ্ড অগ্নিবালা সারি সারি রক্ষিত। নীলাঞ্জী সেই সমস্ত অগ্নিবালা একে একে অতিক্রম করে, ছিটকে এসে পড়ে এক অনুচ্চ পাথরের চত্বরে⋯

সমস্ত সংগীত থেমে যায়।

দলের বুশমেন থেকে বয় কাফ্রিরা পর্যন্ত হাঁটু গেড়ে বসে যেন কাকে প্রণাম জানায়।

নীলাঞ্জীও সেই পাথর চত্বরে নাচের ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে নিবেদন করে কোন অজানিত ব্যক্তিতের কাছে।

সামনেই সোনার থালার মত চাঁদ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে আকাশে।

সারা জঙ্গলভূমি নীরব নিস্তব্ধতায় শান্ত। তার মাঝে হঠাৎ শোনা যায় সর্দারজীর ভারী কণ্ঠ। বলছেন—রণমলজী, এ উৎসব রচনা করেছে বুশমেনরা চাঁদের পূজায়,…এরা যে সব চাঁদের পূজারী! তাই এ উৎসবকে "চন্দ্র মহোৎসব" নাম দিতে পারেন।

অলক্ষ্যের দর্শকদের তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানে এলো।

Wonderful…Fade out…all O. K. Pack up for the day…our days works are done…অর্থাৎ

অদ্ভুত!…এইখানে সিন শেষ হলো…সমস্তই সুন্দর উঠেছে…আজ তবে তলপি তোলা যাক। আমাদের দিনের কাজ সমাপ্ত।

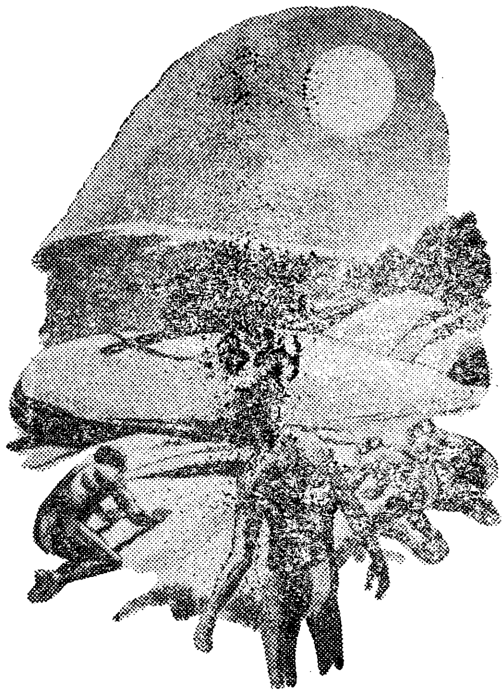

নীলাঞ্জীও নাচের ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে নিবেদন করে… [পৃষ্ঠা ৮১৬

ঘড়িতে তখনও সাতটা বাজেনি।

আকাশের মাঝে পূর্ণচন্দ্রের পাশে সূর্য ঢলে পড়ছে। তবু অফুরন্ত দিনের আলো।

বিষুবরেখার এইটুকুই বিশেষত্ব। আর, চন্দ্র-তপনের মিলন-বাসরঘর হচ্ছে রিয়ানঞ্জারো রেঞ্জের চাঁদের পাহাড়।

সে রাত্রে আর "ব্যাকজারনী" করা হোলো না।

পাহাড় নদীর মধ্যস্থ এই উপলখণ্ড বিছানো ছোট্ট উপত্যকাতেই রাত্রিবাসের আয়োজন করা হোলো।

আমাদের সারি সারি টেন্ট পড়েছে।

সুটিংএর দৌলতে দেশীদের ভাগ্যে আজ মহোৎসব।

জিরাফের মাংসই আজ ওদের উপাদেয় আহার্য, ওতেই হবে ওদের ভোজপর্বের সমাধা।

অবশ্য আমাদের চলবে না। তবে,…

ব্যানার্জি বলছিল—অকসটাং খেয়ে দেখেছি, খুব সুস্বাদ। এবার জিরাফের মাংসটা টেস্ট করে দেখলে কি হয় ?

আমি হেসে বলি—দেখুন না…আপনার তো সংস্কারের বালাই নেই।

মিত্তির আর সুধীর এসে আমাদের টেণ্টে ঢুকলো।

আমি বলি—কি হে মিত্তির !…তুমি আর সুধীর তুই বন্ধুতে সেদিন তো অক্সটাং নিয়ে হাতাহাতি করতে বাকী রেখেছিলে, আজ তুজনে মিলে জিরাফের মাংসটা একটু চেখে ছাখো না ? অঢেল আছে, আজ আর কারও কোনো ভাগে কম পড়বে না। ব্যানার্জি সাহেব তো বলছেন টেস্ট করবেন, কাজেই ব্রাহ্মণেভ্য নমো বলে দাও না সাফ করে…ইতিহাস রচনা হবে জীবনে।

মিত্তির হাসতে লাগলো।

বললো—ওকথা থাক। বলুন আজকের শটগুলো কেমন হোলো ?

বললাম—Performanceএর দিক থেকে Wonderful হয়েছে। তবে সবটাই হচ্ছে তোমার বন্ধুবর শ্রীসুধীরের হাতে, কি বলো সুধীর ?

সুধীর বলে—আমার দিক থেকে কোন কিছুর গণ্ডগোল হবে বলে মনে হয় না। তবে জানি না, আপনার সাউণ্ড ডিপার্টমেণ্ট কতদূর কি করেছে ?

বলি,—জগতাপ আমায় রিপোর্ট পেশ করে গ্যাছে।

মিত্তির জিজ্ঞাসা করে—কি রকম হয়েছে বললে ?

ও বললে, মিউজিক, ড্রাম, গানের মাঝে ঘন ঘন হঠাৎ চিৎকার, সব কটা মিলে একটু jumbled up হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ট্র্যাক লাইন পরিষ্কার পাওয়া যাবে।

আমি বললাম—তাতেই আমার হবে। Post Synchronisation করে নিলেই হবে।

সর্দারজী এতক্ষণ চুপ করে বসে শুনছিলেন। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—

'পোস্ট সিন্‌ক্রোনাইজেশন' ব্যাপারটা কি ? কাল থেকে তো কথাটা অনেকবার শুনলাম।

আমি বলি—কি জানেন, শব্দের ট্র্যাক লাইন ভালো করে পেলে…নতুন সংগীত, নতুন করে ডায়লগ তুলে সেই ট্র্যাক লাইনের ব্যবধান ধরে এডিটিংএর সময় Replace করে নেওয়া চলে। তা বলে সংগীত বা ডায়লগগুলো যা সুটিংএর সময় বলা হয়েছে, ঠিক সেইগুলি ঠিক ঠিক সময়াক্ষেপে স্টুডিওতে বলিয়ে নিতে হয়।

মিত্তির বললে—নীলাঞ্জীর নাচটা ছবির একটা সম্পদ হয়ে থাকা উচিত।

আমি বলি—সত্যই ওটা একটা সম্পদ, কারণ যতই ট্রেনিং দিয়ে আর্টিস্টকে এ নাচ

শেখানো হোক না কেন নীলাঞ্জীর স্বভাবসুলভ সারল্য আর সাবলীল গতিভঙ্গীর কাছে দাঁড়াতে পারতো না।

এ হয়েছে একেবারে ন্যাচারাল কি বলেন ?—মিঃ মিত্তির বলে ওঠে।

আমি বলি—ন্যাচারাল হোলেই যে অনবদ্য আর্ট হবে তার মানে নেই। বলা যেতে পারে, এ নাচটা নীলাঞ্জীর নাচের একটা Actual Occurrence, এটা তার Performance নয়।

একটু বোঝবার চেষ্টা করে মিত্তির আর সুধীর টেণ্ট ত্যাগ করলো। আমি চেঁচিয়ে বলি—কি হে, তোমরা জিরাফের মাংস খাচ্ছো তো ? খেয়ে ফেলো—খেয়ে ফেলো। কথায় বলে 'যস্মিন দেশে যদাচারঃ'।

সর্দারজী হেসে বলেন—জিরাফের মাংস নিয়ে ঠাট্টা করছেন মিঃ বোস, তবে কি জানেন, সব মাংসেরই টেস্ট প্রায় একই ধরনের। তবে কেউ একটু নরম, কেউ একটু চোঁচুলা অর্থাৎ শক্ত !

পৃথিবীতে শুনেছি মানুষের মাংসই সব চেয়ে সুস্বাদু। জানি না, তবে যতদূর এক্‌স্‌পিরিয়েন্স আছে তাতে উট জিরাফ ঘোড়ার মাংস একই ক্যাটাগরিতে পড়ে।

আমি বলি—আপনি জিরাফের মাংস কখনও খেয়েছেন নাকি ?

উনি বলেন—খেয়েছি তো বটেই···আজ রাত্রেও খাবো ! ওটা আমার ভালই লাগে।

আমি চুপ করে থাকি। আমার অভিজ্ঞতায় ছাগল-ভেড়ার মাংস বা বড়জোর দু'চার রকম পাখীর মাংস পর্যন্ত···স্বাদ বিস্বাদের কথা ওঠে···তাও অতি সন্তর্পণে অনন্যোপায় হয়ে খাই। তাই আমার কাছে এই অবিচার আহার্যের স্বাদ আস্বাদ সম্বন্ধে মতামত খানিকটা গ্রীক ভাষারই সমতুল।

*　　*　　*　　*

সর্দারজী হয়ত বুঝতে পেরেছেন···জঙ্গলে হলেও আমি এসব রসের রসিক নই। তাই একটু চুপ করে থেকে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—ওদের চন্দ্র মহোৎসব কেমন লাগলো ?

আমি বলি, খুবই ভালো লেগেছে সর্দারজী, এ এক আমার নতুন অভিজ্ঞতা। বন্য জংলীদের উৎসব অনেক রকম দেখেছি···এরকমটা আর কখনও দেখিনি। জঙ্গলের বীভৎসতা নেই আমাদের দেশের জংলীদের উৎসবে। তারা সব মহুয়ার মদ খেয়ে ভোম্ হয়ে নাচে, গান করে, তীর ধনুকের খেলা দেখায়···মেয়েরা নানান রকম নাচের কসরতি দেখায় ; কিন্তু নীলাঞ্জীর মত অঙ্গের প্রতি মাংশপেশী চালনার ক্ষমতা ভারতের কোনো আদিম জাতই পারে বলে মনে হয় না।

আমি অবশ্য সাঁওতালদের নাচই প্রধানতঃ দেখেছি। দেখেছি ঘাটশীলার অনতিদূরে সোনাগড়ার পাহাড়ী এলাকায় সাঁওতালদের উৎসব।

প্রায়শঃ লক্ষ সাঁওতাল আর সাঁওতালনি এসে মিলিত হয় এই মেলায়। তাদের সঙ্গে

এক একটা জয়ঢাক থাকে যার ভেতরের ঘের (Diameter) বোধ হয় ৭।৮ ফুটের ওপর হবে। একেবারে লোমযুক্ত কাঁচা চামড়ার বাঁধাই…পিটে পিটে তার মাঝখানের লোম উঠে গেছে… বাকী পাশগুলো এখনও লোমশ রয়েছে।

এদের শিকার নাচ…শত্রু বিজয় নাচ…মেয়েদের মনের মানুষ ভোলানো নাচ…এমনি-তর কত রকমের নাচই না দেখেছি; কিন্তু শিল্পজ্ঞানে আফ্রিকার অধিবাসীদের, বিশেষ করে মেয়েরা ওদের হার মানিয়ে দিয়েছে। এ দেশ ঘুরে দেখছি…প্রতি পঞ্চাশ মাইল অন্তর নতুন নতুন জাত। তাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্মানুষ্ঠান, নাচ গান উৎসব সবই যেন একের থেকে অপরের বিভিন্ন; কিন্তু প্রত্যেকের নাচের মধ্যে কলাকুশল যেন অতি সূক্ষ্ম… সেটা বন্য অধিবাসীদের মধ্যে কেমন করে এসেছে আমি ভেবে পাই না।

ধরুন এই বুশমেনদের চন্দ্রমহোৎসবটা। এটার the very ideaটি কেমন Romantic.

আমাদের সভ্য মানুষের মধ্যে…বিশেষ করে ভারতীয়দের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের তিথি ধরে কত কতই না উৎসব করি, বিশেষ করে বৈষ্ণবদের রামলীলা…কি ঝুলন উৎসব বা দোললীলা…সেখানেও পূর্ব যুগ থেকে নাচ গান মনের উদ্দাম উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়ে আসছে। আবার দেহাতী সভ্যেরা রচনা করে এমনি চাঁদকে ঘিরে তাদের সংগীত আসর যেমন বিহারের চৈতী কাজ্‌রী—এতেও নাচ রয়েছে, ঝুলায় ঝুলায় দোল খেয়ে কত রঙ্গ কত ব্যঙ্গ গানে গানে জমিয়ে তোলে…কখন বরষার সঙ্গে ময়ূর ময়ূরীর মত সবাই মিলে পেখম তুলে নাচতে শুরু করে; কিন্তু দেহের সঙ্গে এমন নাচনের ঢেউতরঙ্গ তুলতে কখনও দেখিনি।

চোখের ইশারা আছে…হাতের মুদ্রা আছে…কিন্তু প্রতি মাংসপেশীর এমন দর্শনীয় আবাহন আমাদের কোনো চন্দ্রোৎসবে দেখিনি।

আরও একটা জিনিস বড় ভাল লাগলো—সেটা এদের চন্দ্রদেবতার পূজা। আমাদের দেশে চন্দ্রকে আকাশে রেখেই তার চন্দ্রকিরণ অমিয়ে স্নান করে, অবগাহন করে নিজেদেরই মধ্যে নাচ-গান-সংগীত আসরে মেতে ওঠে; কিন্তু এদের মাতন চন্দ্রকেই কেন্দ্র করে…তাকে আহ্বান জানিয়ে মনের কাতর উক্তিতে তার কাছে নিজের অন্তরের পূজা পাঠিয়ে দেবার দুরন্ত প্রয়াসটুকুতেই।

রণমলভাই এখনও পর্যন্ত আমাদের আসরে অনুপস্থিত। তাই সর্দারজী বল্লেন—রণমল-ভাই-এর কী হলো…এখনও পর্যন্ত ফিরে এলেন না তো?

আমি বলি—তিনি তো কালকের আয়োজনে স্যুটিং শেষ হতেই বুশমেন সর্দারকে নিয়ে নৌকা করে বেরিয়ে গেলেন। ফিরতে দেরি হচ্ছে কোনো বিপদ-টিপদ হোলো না তো!

সর্দারজী বলেন—নেহি…নেহি, বিপদ হবে কেন…তবে তাঁর অনুপস্থিতিটা কেমন যেন লাগছে।

রণমলভ ই এসে উপস্থিত হয়ে গেলেন।

আমি বলি—এই সর্দারজী আপনার কথাই বলছিলেন···বাঁচবেন অনেক দিন।

তিনি হেসে বলেন—দেখি কাল থেকে দেশের পথে পা বাড়াচ্ছি—এই যাত্রায় বেঁচে ফিরলে তবেই না অনেক দিনের কথা।

আমি বলি—আজকের যুগেও কি এমনি তর ভয় রয়েছে জঙ্গলে ?

জঙ্গলে ভয় চিরদিনই থাকবে। জংলীদের গায়ে আজকের জাগরণের হাওয়া এসে কোনদিনই লাগবে না—কাজেই তারাও চিরদিন এমনি ভয়ালই থেকে যাবে মিঃ বোস। কাজেই ভয় নেই বল্লে মিথ্যা বলা হবে।

সর্দারজী মৃদু হেসে বলেন—খতর্···একটু থাকবে বইকি জঙ্গলে, তাইতো এ পথের পথিকদের যাত্রাকে বলা হয় Adventure. জঙ্গলে জন্তু জানোয়ার আদমখোরদের হাতে মৃত্যু হলেও তাই বলা হয় Romantic মৃত্যু। আর জয়ী হয়ে ফিরে এলেও সবাই বলেন—হিরো।

তারপর হা-হা করে হেসে উঠে বলেন—এ আপনাদের ছবির হিরোর থেকে ঢের বেশী ইজ্জতের।

আমি বলি—রণমলজি আমাদের ছবিরও হিরো আর জঙ্গলেরও হিরো। কি বলেন রণমলভাই ?

সবাই হেসে উঠি।

এমন সময় খাবার জন্যে ডাক এলো।

রণমলভাই আর আমি নিরামিষাশী···তাই ওদের ভোজসভায় উপস্থিত হলাম না।

রণমলভাই বললেন—খুব বড় একটা আনানেস এনেছি···আর কেল, অ্যাভাগোটা পিয়ার আছে···টিনমিল্ক দিয়ে আসুন খেয়েনি। এতে যদি না পেট ভরে তাহলে দুখানা রোট্‌লি আচার দিয়ে খেলে হবে।

সত্যি অত বড় আনারস আমার জীবনে আমি কখনও দেখিনি, যেমন মিষ্টি তেমনি রসাল। মাঝের বুকোটা পর্যন্ত নেই, সবটাই যেন রসে টইটম্বুর।

কলার সাইজ এক হাত পরিমাণ লম্বা···মাখনের মত নরম···স্বাদে অপূর্ব। রোট্‌লি অর্থাৎ রুটি (পাতলা পাতলা রুটিকে গুজরাটীরা রোট্‌লি বলে)···অ্যাভাগোটা পিয়ার আর দুধের ক্ষীরে ডুবিয়ে সে রাত্রের আহার শেষ করলাম।

(১৭)

ভোর চারটায় নৌকা ছাড়া হোলো।

তখনও পশ্চিম আকাশে গতরাত্রির পূর্ণচন্দ্র আকাশের শেষ সীমানায় দেখা যাচ্ছে। তার অমলিন জ্যোৎস্নাধারায় আমাদের সামনেই মাউণ্ট অফ দি মুনের হিমাঙ্গগুলিকে যেন সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। সে আলো বরফের উপর প্রতিফলিত হয়ে হীরের মত ঝলমল করছে।

পাশের বনে বনে সে চন্দ্রকিরণের রেশ এসে বনস্পতির পাতাগুলোকে যেন রূপালী সজ্জায় সাজিয়ে দিয়েছে।

পূর্বাকাশে অরুণোদয়ের সময় এসে পড়েছে, তাই পূর্বদিকচক্রবালে লালের আভার ছিটে।

নৌকার গতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাচলের অন্ধকার যেন অবগুণ্ঠন খুলে চোখ মেলবার চেষ্টা করছে। নববধূর প্রথম সলজ্জ রক্তিম চাহনির মত, ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাচ্ছে। সেই অনির্বচনীয় রঙে আমাদের মনেও প্রতিক্ষণে ইন্দ্রধনু খেলে যাচ্ছে।

আমরা তীরবেগে এগিয়ে চলেছি আজের খেলা আজই সাঙ্গ করে প্রাক্‌সন্ধ্যায় ক্যাম্পে ফিরতে হবে।···

ভোরের হাওয়ায় মাঝিমাল্লাদের একটানা জংলী সুর যেন এক অসীম উদ্দামতার দিকে চেয়ে ভবিষ্যতের পথ মাপছে।

দাঁড়ের শব্দে নদীর থেকে হুস্ হুস্ করে মাথা তুলে ধরছে কিবাকোর দল। তীরের দিকে প্রথম আলো এসে পড়ছে···সে আলোয় হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো—দুই তীরের স্বল্পপরিসর উপলবেলায় সারি সারি জঙ্গলের কাটা গাছের লগ পড়ে থাকার ওপর। যেন সেই "লগ"গুলো কারা অবিন্যস্ত অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছে।

হঠাৎ মাখন সিংএর বন্দুকের মুখ থেকে পর পর অগ্নিস্ফুরণ হতে লাগলো। সে আওয়াজে বনস্থলী রণিত ঝনিত হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তীরের লগগুলো যেন জীবন্ত হয়ে সরসর করে জলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

—ওরে বাপরে!···ওগুলো সবই জ্যান্ত ম্যানইটার কুমীর···এতো কুমীর!

জলে ডাঙ্গায় সব জায়গায় যেন কারা এদের এনে জড়ো করে রেখেছে এই জলেস্থলে।

ঝপঝপ করে দুপাশ থেকে পরপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে রাশি রাশি ঘড়িয়াল।

জল স্বচ্ছ···তাই নীচে পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। তার দিকে নজর দিয়েও দেখি, তার মধ্যে রেপটাইল হাউসের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে কুমীর আর কিবাকোর দল।

বলি—এ নদীতে নৌকা এগুবে কি করে?

নৌকা কিন্তু এগিয়ে চলে ওদের নীচের তলায় ফেলে। সারা নবাগতের দল এ দৃশ্যে থরথর করে কাঁপতে থাকে। পাশের দিকে চেয়ে দেখলাম সর্দার মাখন সিং আর রণমলভাই পরস্পরে চাওয়াচাওয়ি করে মৃদু মৃদু হাসছেন।

নৌকাগুলো নদী ছেড়ে হঠাৎ ঢুকে পড়লো ছিলে-পড়া একটা শাখা নদীর জলস্রোতে।

এ স্রোতের টান খুব। তাই নৌকার গতি কেমন ধাক্কা খেয়ে কমে এলো। কিন্তু, সুখের বিষয় এই নদীতে অমন বোঝাই করা কুমীর পোষা নেই। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এই নদীর জলস্রোত ধরে ধীরে ধীরে পাহাড়ী এলাকার উঁচুতে যে উঠছি তা বোঝা গেল। প্রায় বারজন বয় আর মাঝি নৌকা তীরে দাঁড় করিয়ে তীরে নেমে গেল। দেখলাম তারা তীর দিয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নৌকাগুলোকে গুণ টেনে এগিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে নৌকাগুলো এসে থামলো একটি কিনারায়।

আমাদের সর্দারজীর order হোলো সবাইকে নামতে।

তীরের এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে বড় বড় বনস্পতি মাথা উঁচু করে আকাশপানে চেয়ে দাঁড়িয়েছে। তারই মধ্যে মধ্যে সূর্যকিরণ পৌঁছে বনস্থলীকে আলোছায়ায় চিত্রিত করেছে।

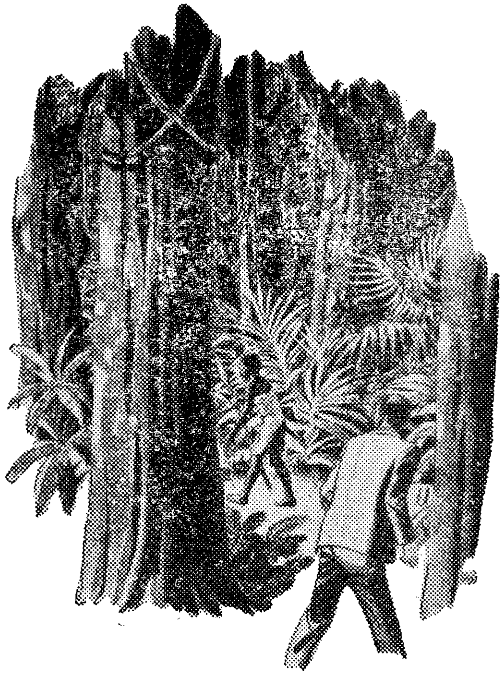

সর্দারজী follow করে পিছনে পিছনে দ্রুত এগিয়ে চলেন।

নীলাঞ্জীকে একহাতে দোধারী বর্শা অপর হাতে রেশমী দড়ি নিয়ে সেই বনস্থলীর মধ্যে ঢুকে যেতে দেখলাম।

সর্দারজী তাকে যেন follow করে পিছনে পিছনে দ্রুত এগিয়ে চলেন। অতএব সারা দলটি তাঁকে অনুগমন করে।

* * *

গহন অরণ্যের ঝরাপাতার ওপর মচমচ আওয়াজ করে সবাই চলেছি সর্দারজীকে অনুসরণ করে। এগিয়ে পড়েছেন সর্দারজি, রণমলজি আর নীলাঞ্জী।

তাদের পেছনে ভুলুয়া, শেঠজী আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা অভিযানের ছন্দে মার্চ করে চলেছেন···

হঠাৎ জঙ্গলের অপরদিক থেকে প্রতিধ্বনির মত নীলাঞ্জীর চিৎকার ভেসে এলো··· বানাবুকা হুঁশিয়ার···

(ক্রমশঃ)

হাঁদা ভোঁদার
লুকোচুরি
আয় ভোঁদা, আমরা লুকোচুরি খেলি! তুই যেখানেই লুকোস না কেন, আমি বাজী রেখে পাঁচ মিনিটেই তোকে বের করে ফেলবো!
তাই বুঝি!
ঠিক আছে হাঁদা! কিন্তু দশ পর্যন্ত গোণা শেষ না হলে আমার দিকে দেখবি না!
কুকুরের ঘরটা দেখার কথা ও চিন্তাই করবে না!
এক – দুই – তিন – চার —
— পাঁচছয়সাতআটনয়দশ! আহা! জলের মতো সোজা!
আরে! কুকুরের ঘরের পেছনের তক্তা দেখছি আলগা!

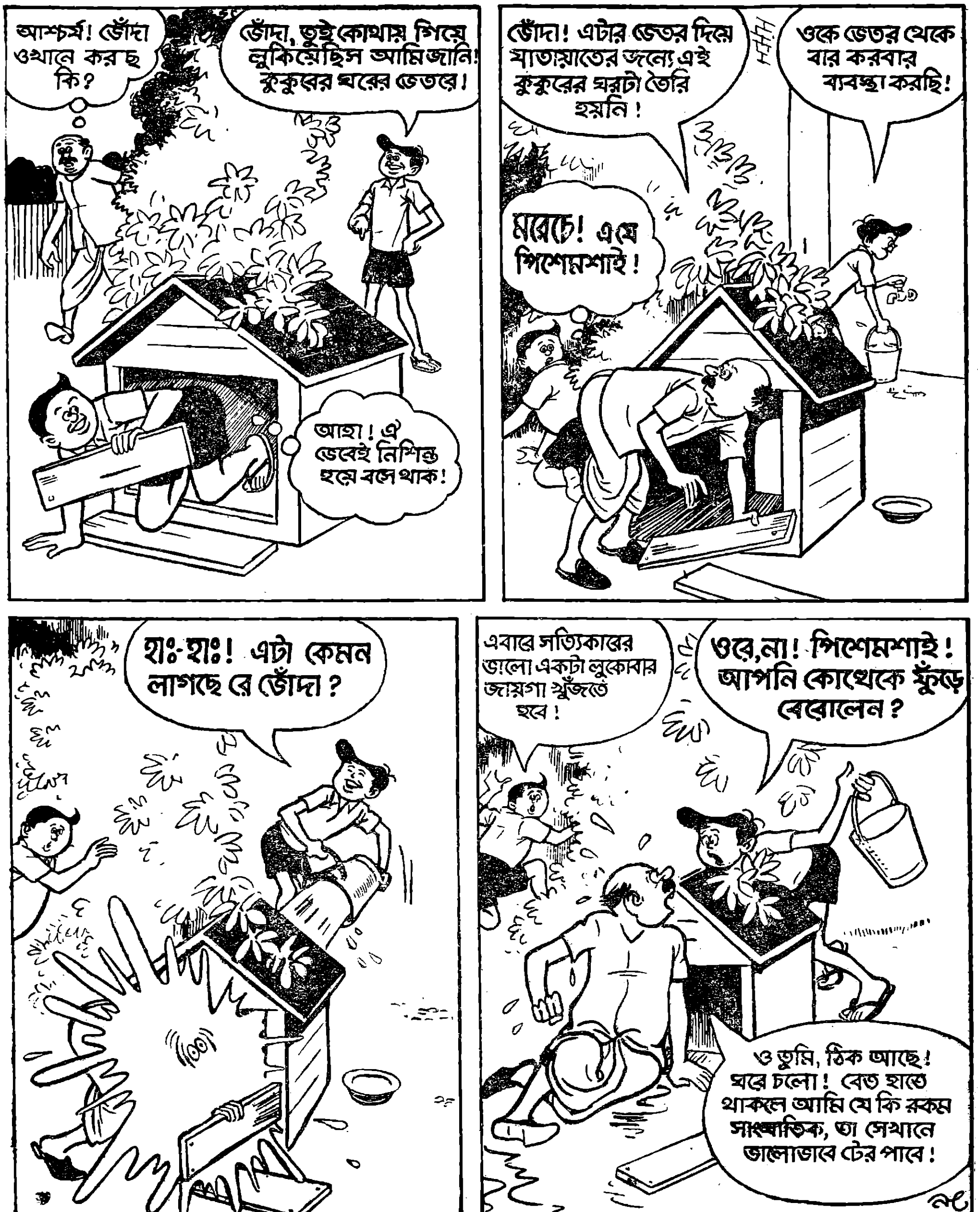
আশ্চর্য! ভোঁদা ওখানে করছ কি?
ভোঁদা, তুই কোথায় গিয়ে লুকিয়েছিস আমি জানি! কুকুরের ঘরের ভেতরে!
আহা! ঐ ভেবেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক!
ভোঁদা! এটার ভেতর দিয়ে যাতায়াতের জন্যে এই কুকুরের ঘরটা তৈরি হয়নি!
ওকে ভেতর থেকে বার করবার ব্যবস্থা করছি!
মরেচে! এযে পিশেমশাই!
হাঃ-হাঃ! এটা কেমন লাগছে রে ভোঁদা?
এবারে সত্যিকারের ভালো একটা লুকোবার জায়গা খুঁজতে হবে!
ওরে, না! পিশেমশাই! আপনি কোত্থেকে ফুঁড়ে বেরোলেন?
ও তুমি, ঠিক আছে! ঘরে চলো! বেত হাতে থাকলে আমি যে কি রকম সাংঘাতিক, তা সেখানে ভালোভাবে টের পাবে!

বাঙালী ভোজনবীর

অম্বুজেন্দ্র ঘোষ

সে অনেকদিন আগের কথা। সুবে বাংলার নবাব তখন সিরাজদ্দৌলার দাদু আলিবর্দী খাঁ সাহেব। বুড়ো মানুষ আলিবর্দী, কিন্তু হলে হবে কি, তাঁর দক্ষতা এবং কর্মশক্তি তরুণের চেয়েও কোন অংশে কম যায় না। মুর্শিদাবাদে রাজধানী তাঁর, সেখানেই তিনি থাকেন, অথচ গোটা বাংলা দেশের কোন্ কোণে কোন্ আলপিনটি পড়ে আছে সে খবরও তাঁর নখদর্পণে। দিব্যি সুখে শান্তিতে তাঁর শাসনে দেশ চলছিল। এই সময় হঠাৎ একদিন খোদ মুর্শিদাবাদেরই জেলখানার মধ্যে ঘটে গেল এক আশ্চর্য ঘটনা। ঘটনাটা শোন তবে বলি।

নবাব সাহেবের নির্দেশমত জেলখানার কয়েদীদের মাঝে মাঝে মাংস খেতে দেওয়া হত। একদিন জেলখানার একজন খানসামা বেশ বড়সড় একটা ছাগলের গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে তাকে কাটবে বলে। ছাগলটা বোধ হয় তার আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনাটা আঁচ করতে পেরেছিল, তাই সমানে ম্যা-ম্যা করে গলা কাঁপিয়ে চেঁচাচ্ছিল। হঠাৎ কারাগারের একজন বন্দী আচমকা কোথা থেকে এসে খানসামার গায়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হেঁচকা টানে ছাগলটাকে ছিনিয়ে নিয়েই নিজের ঘরের দিকে মারল চোঁচা দৌড়। খানাসামা তো থ। হতভম্ব হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই। ব্যাপারটা কি যে ঘটে গেল সে যেন বুঝে উঠতেই পারল না। ওদিকে সেই বন্দী ছাগলটাকে নিজের পাচক ব্রাহ্মণকে দিয়ে বেশ ভাল করে রাঁধিয়ে খানিক পরে গোটা খাসীটার সবটুকু মাংস একাই খেয়ে নিল চেটে পুটে। একটুও অবশিষ্ট রইল না আর কারও জন্য। জেলের অন্যান্য কয়েদীরা, প্রহরীরা এবং সেই খানসামা তো বটেই, রুদ্ধনিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল শুধু কাণ্ডটা।

ওদিকে লোকের মুখে মুখে এই ঘটনাটার কথা জেলখানার উঁচু পাঁচিল টপকিয়ে শহরেও ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী খাঁ সাহেবের কানেও পৌঁছে গেল। নবাব কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না ঘটনাটাকে। গোটা একটা খাসীর মাংস হজম করা কি খেলা কথা! তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাছে হাজির করতে বললেন সেই বন্দীকে। নির্দিষ্ট সময়ে বন্দী এল নবাবের সামনে। নবাব তাকে জিজ্ঞাসা করা মাত্রই সে গড়গড় করে সব কথা স্বীকার করে গেল। নবাব তো হতবাক্। হঠাৎ তাঁর মাথায় এল এক বুদ্ধি। পরীক্ষা করার জন্য তিনি আর একটা ছাগল আনিয়ে বন্দীকে

সবটুকু মাংস নবাব সাহেবের সামনেই খেয়ে ফেলল।

দিলেন খেতে। আবার খাবার পেয়ে বন্দীর সে কি আনন্দ! মহানন্দে সে সেটিকে রান্না করিয়ে দিব্যি সবটুকু মাংস নবাব সাহেবের সামনেই খেয়ে ফেলল। জেনে আশ্চর্য হবে যে, বন্দীর কাণ্ড দেখে নবাব কিন্তু রাগ করলেন না মোটেও, বরং এই ভেবে লজ্জিত হলেন যে, যে লোক এত খেতে পারে, তার তো খাওয়ার জন্যেই প্রচুর টাকা খরচ হয়ে যায়, সুতরাং খাজনার টাকা সে কেমন করে দেবে। খাজনা সময়মত না দিতে পারাতেই বন্দীকে জেলখানায় আটক করা হয়েছিল। তাই নবাব আলিবর্দী তৎক্ষণাৎ বন্দীকে দেনার টাকা থেকে অব্যাহতি দিয়ে মুক্তি দিলেন। শুধু তাই নয়, নিজের খাওয়ার খরচ মিটিয়েও খাজনার টাকা বন্দী যাতে ভবিষ্যতে দিতে পারে তার জন্যে কলকাতার ডায়মণ্ডহারবারের কাছে একটি জমিদারিও দান করলেন। ইতিহাসে এই জায়গাটির নাম 'আবদাখালী মহল' বা 'খোরাকী মহল'।

অনেকের মতে, উপরের ঘটনাটি নিছক গল্প কাহিনী নয়। ছুটি গোটা খাসী যিনি খেয়েছিলেন তিনি বিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরী বংশের শিবদেব রায়। লোকে এঁকে সন্তোষ রায় নামেই জানতো। বেহালা-বড়িষার আদি জমিদার ছিলেন এঁরা। দক্ষিণেশ্বর থেকে বেহালা-বড়িষা পর্যন্ত ছিল এঁদের জমিদারি। কথিত আছে, বর্গীর হাঙ্গামার সমসময়ে খাজনা দিতে না পারায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং সন্তোষ রায়,—উভয়কেই নবাব আলিবর্দী খাঁ মুর্শিদাবাদ কারাগারে বন্দী করে নিয়ে যান।

ছোট্টবেলা থেকেই তো তোমরা কত কত বাঙালী কুস্তিগীর মল্লবীর আর সন্তরণ বীরপুরুষের কাহিনী পড়েছ। জমিদার সন্তোষ রায়কে 'বাঙালী ভোজনবীর' আখ্যা দিলে নিশ্চয়ই কিছু ভুল করা হবে না। তাই না?

একটি মজার গল্প

সোনা মুখার্জী

লোকটা জানায়, 'পতা নেহীজী।'

[একটি প্রচলিত হিন্দী হাসির গল্পের কাঠামো অবলম্বনে লেখা হয়েছে।]

মিস্টার টমসনের বহুদিন থেকে ইচ্ছা, ভারত ঘুরে গিয়ে এমন একটা বই লেখেন যা তাকে অমরত্ব দেবে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে তার সে সুযোগ হোল।

আসবার সময় তার ভারতীয় বন্ধু বলে দিলেন, হিন্দীতে সবাইকে সম্বোধন করার সময় নামের শেষে 'জী' ব্যবহার করতে হয়; যেমন—'লালাজী', 'চন্দ্রভানজী' ইত্যাদি। আরও বলেছিলেন যে, আগ্রার 'তাজমহল', দিল্লীর 'কুতুবমিনার', আমেদাবাদের 'ঝুমতা মিনার' অবশ্য অবশ্য দেখবে।

টমসন তো ভারতে এসে নোটবই আর পেন হাতে ঘুরে বেড়ান। যা নূতন বা সুন্দর দেখেন তাই নোট করে রাখেন।

বম্বে থেকে প্রথমেই আমেদাবাদ গিয়ে স্কুটার রিকশাকে বলেন, 'ঝুমতা মিনার' চলো। সাহেব তো ঝুমতা মিনার দেখে অবাক। কি আশ্চর্য! একজন লোক মিনারের একটা জায়গা ধরে নাড়লেই একসঙ্গে চারটে মিনারই দুলতে থাকে। অপূর্ব স্থাপত্য!

মুগ্ধ সাহেব দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করেন, 'এই মিনার কে বানিয়েছে বল তো।'

বেচারা দারোয়ান কি জানে কে এটা বানিয়েছে। তাই অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'পতা নেহীজী' (অর্থাৎ 'আজ্ঞে জানি না')।

টমসনের বন্ধু বলে দিয়েছেন নামের শেষে 'জী' বলা হয়। সুতরাং সাহেব তার নোট বইয়ে লেখেন, 'পতা নেহী' নামক একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার 'ঝুমকা মিনার' তৈয়ারী করেছেন। এই শিল্পীর নিকট আমাদের এখনও অনেক শিল্প-কৌশল শিক্ষা করার আছে।

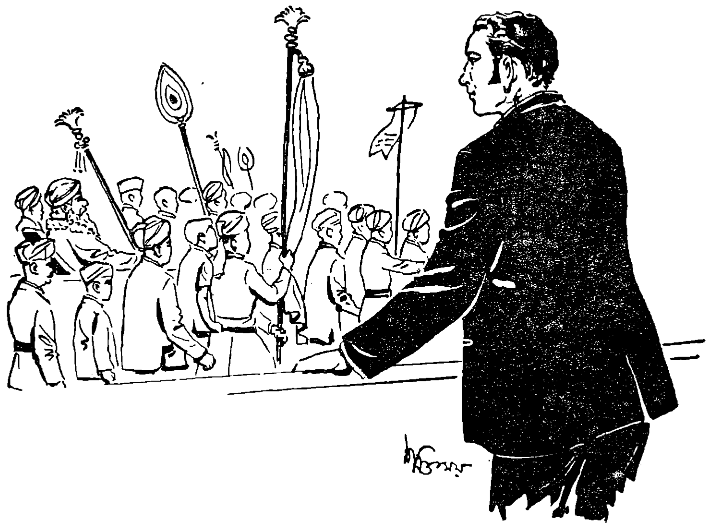

বৃদ্ধ ব্যক্তিকে প্রশেসন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। [পৃষ্ঠা ৮৩০

তারপরে এলেন আগ্রায়। পূর্ণিমা রাতে তাজমহল দেখে একেবারে অভিভূত। চাঁদের আলোয় মুক্তোর মত ঝকমক করছে তাজমহল। প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা পরে যখন সংবিত পেয়ে হোটেলে ফিরছেন, দেখেন কেউ নেই যাকে জিজ্ঞেস করবেন, তাজমহল কে বানিয়েছে। একটু যাওয়ার পরে দেখেন একজন কুষ্ঠরোগী রাস্তার ধারে শুয়ে আছে। সাহেবকে দেখেই হাত পেতে বলে, 'সাহেব পয়সা।' টমসন তাকে একটা টাকা দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'বলতে পার তাজমহল কে বানিয়েছে ?'

জানে না তাই দুঃখের সঙ্গে লোকটা জানায়, 'পতা নেহীজী।'

হোটেলে ফিরে এসে সাহেব নোট বইতে লেখেন, ভারতের ইঞ্জিনিয়ার পতা নেহীজীর শিল্প-সৌকর্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, ইনি শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার। এ কে কেন যে আজও 'নোবেল পুরস্কার' দেওয়া হয়নি আমি ভেবে পাচ্ছি না।

অবশেষে টমসন দিল্লী এসে পৌঁছল। হোটেলে পৌঁছে স্নান করে খেয়েই চলেন কুতুবমিনার দেখতে। কুতুবমিনারের তলায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে ওঠেন, সত্যি অপূর্ব স্থাপত্য।

তারপর এক বাদামওয়ালার কাছে বাদাম কিনে জিজ্ঞেস করেন, 'কুতুবমিনার কে বানিয়েছে বলতে পার ?'

বাদামওয়ালা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'পতা নেহীজী।'

হোটেলে ফিরে এসে উচ্ছ্বসিত আনন্দে প্রায় তিন পাতা লিখে ফেললেন পতা নেহীজীর স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে।

হঠাৎ বাইরে গোলমাল শুনে বারান্দায় এসে দেখেন, একজন আভিজাত্যপূর্ণ, সৌম্য দর্শন, অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিকে প্রশেসন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। টমসন মনে মনে ভাবেন, নিশ্চয়ই ইনি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

বেয়ারা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'প্রশেসন করে কাকে নিয়ে যাচ্ছে?'

বেয়ারা বলে, 'পতা নেহীজী।'

সাহেব ভাবেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থপতি, পতা নেহীজীকে দেখবার সৌভাগ্য হোল।

কয়দিন পরে কনট্ প্লেস থেকে কিছু কিওরিও কিনে সাহেব ট্যাক্সিতে যাচ্ছেন, কিছু দূর যাওয়ার পরে ট্যাক্সি থেমে গেল। কোন একজন বিশিষ্ট পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফুলের মালার পাহাড় জমেছে মৃতদেহের উপরে। বহু লোক বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে শবের পিছে পিছে। টমসন ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে! কার মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে?'

ড্রাইভার উদাস কণ্ঠে বললো, 'পতা নেহীজী।'

শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রদ্ধা জানাতে মাথার টুপি খুলে ফেললেন। টমসনের মন দুঃখে ভরে গেল।

হোটেলে এসে নোট বইয়ে লিখলেন, আজ ১৯৫৮ সনের ১৭ই ডিসেম্বর। আজ ভারতের তথা বিশ্বের বিশিষ্ট স্থপতি 'পতা নেহীজী'র দেহান্ত হয়েছে। আমি প্রভু যীশুর কাছে তাঁর আত্মার সংগতি প্রার্থনা করি। আমার দুঃখ রইল, পৃথিবীর সভ্য সমাজ এই মহান্ ব্যক্তিকে 'নোবেল প্রাইজ' রূপ উপযুক্ত সম্মান দিয়ে নিজের লজ্জা লাঘব করবার সুযোগ পেল না। একজন সভ্য মানুষ হিসেবে আমি তাই দুঃখিত, লজ্জিত। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই মহান্ স্থপতি বিশ্বের ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবেন।

সহজ উপায়

সুতপা মিত্র

শিক্ষক—চাঁদের আকর্ষণ শক্তি খুব কম। কাজেই যে কোন জিনিস চাঁদে নিয়ে গেল তা হাল্কা বলে মনে হবে।

ছাত্র—তাহলে আমি আমার অঙ্কগুলো নিয়ে যাব, স্যার। ওগুলো আমার খুব ভারী লাগে।

চেষ্টার ফল

পূরবী দেবী

চাবুক মেরে প্রজা শাসন করা ছেড়ে দিয়ে জমিদারের ছেলে যদি কলম নিয়ে বসে সাহিত্য রচনা করে তাহলে ঘটনাটা বিস্ময়কর হয়ে ওঠে বইকি। তাই করতে দেখা গেল বীরভূমের এক জমিদার পুত্রকে কলকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে এক টিনের ঘর ভাড়া নিয়ে।

কোথায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইচই করে বেড়াবে জমিদারের ছেলে, তা নয় যত সব তার উল্টো সৃষ্টি। হাতের লেখা কপি নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকার ও মাসিকপত্রের অফিসে ধর্ণা দিতে শুরু করলেন তিনি।

অখ্যাত লেখককে কে আর খাতির করে পড়ে। তাই সে সব লেখা বস্তাবন্দী হয়ে না-পড়া অবস্থায় পড়ে থেকেছে কোন কোন মাসিকপত্রের দপ্তরে।

কিন্তু সেই ছেলে যে এককালে একজন প্রসিদ্ধ লেখক হয়ে উঠবে আর কেউ না বুঝলেও তার শৈশবের একটা ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।

তখন তার বয়স আর কতই বা হবে। ছ-সাত বছরের বেশী নয়। একদিন সে তার আর দুজন বন্ধুর সঙ্গে বাইরের ঘরে খেলছে। ঘরের সামনেই একটা উঠোন। উঠোনের উপর সারি সারি অনেকগুলো গাছ। তাদের চোখের সামনেই গাছ থেকে একটা পাখির ছানা মাটিতে এসে পড়ল।

ছেলে তিনজনেই ছুটে গেল ছানাটার দিকে। আহত ছানাটা সযত্নে হাতের উপর তুলে নিয়ে তারা তার শুশ্রূষা শুরু করে দিল। শিশুদের অত যত্ন বোধ হয় ছানাটার সইল না। তাই একটু খাবি খেয়েই সে পটল তুললে। মরা ছানাটা ছেলেরা সেই গাছের নীচেই মাটি খুঁড়ে সমাধি দিলে।

এদিকে ছানাটির মা করুণ আর্তনাদ করে একবার মাটিতে নেমে আসছে আবার ছটফট করে উঠে ডালে গিয়ে বসছে।

ছেলেদের মধ্যে একজনের নাম ছিল পাঁচু। তার জিভ দিয়ে কথাগুলো স্পষ্ট বেরোতো না। সে ডাকছেকে বলে দাকছে এসেছে কে বলে এচেছে। সেই পাঁচুর মনটা যেন কেমন করে উঠল। সে একটা খড়ি নিয়ে দরজার উপর লিখে দিলে,

তারাদাদার পাখির ছানা মরিয়াছে আজি,
তার মা এসে কাঁদিতেছে কেঁউ কেঁউ করি।

তার দাদা বলে যে ছেলেটিকে উদ্দেশ করে কবিতা পাঁচু লিখে ফলল্লে, তার নাম তারাশঙ্কর। তারাশঙ্কর বয়েসে বড় তাই পাঁচুর কবিতা দেখে তারও আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল। সেও তৎক্ষণাৎ লিখে দিলে,

পাখিটা মরে গিয়েছে, মাটির তলায় দিলাম সমাধি,
তার মা-টা কেঁদে ফিরেছে, আমরা সবাই মিলিয়া কাঁদি।

পাঁচু লিখেছে দুলাইন, তারাশঙ্কর লিখে দিলে চার লাইন। তারপর থেকে প্রায়ই কবিতা লেখা মক্স করত সেই ছেলে।

তখনকার দিনে গান শেখা, কবিতা লেখা এই সব কাজগুলো অভিভাবক শ্রেণীর লোকেরা গোল্লায় যাওয়ার পর্যায়ে ফেলতো। তাই ছেলেদের এই প্রচেষ্টা তারা ভাল চোখে দেখত না। তাই কাজটি যে গোপনে করতে হত তা বলাই বাহুল্য।

সে যাহোক তারাশঙ্কর বড় হয়ে সাহিত্য সাধনা ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে গা ভাসিয়ে দিলেন। রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে তাঁকে কারাবরণ করতে হল। সেই সময়ে নেতাদের দলাদলি ও স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা দেখে তাঁর মনে ঘৃণা হতে থাকে। রাজনীতি ছেড়ে দেবেন বলে সংকল্প করে বসেন তিনি। তারপর রাজনীতি ছেড়ে ব্যবসা করতে গিয়ে অতি চালাক লোকদের কাছে ঘা খেয়ে তিনি মানুষের সততার উপর বিশ্বাস হারালেন।

একবার কোন কাজে তিনি সিউড়ি যান। রাত্রে মশার উপদ্রবে ঘুমের ব্যাঘাত হতে থাকে। কি করে তিনি রাত কাটান যান? হাতের কাছে একটা বই ঠেকল। বইটা চোখের সামনে তুলে পড়তে লাগলেন। পরপর দুটো গল্প পড়ে ফেললেন। গল্প পড়ে তাঁর মনে হল এগুলো যদি ছাপা হতে পারে তাহলে তাঁর লেখাও ছাপা হবে। তারপরই একটা গল্প লিখে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতার কোন এক নামকরা সংবাদপত্রে। সঙ্গে সঙ্গে সেটা ছাপা হয়ে গেল।

প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ না হতে তিনি কলকাতার মনোহরপুকুরে একটা টিনের ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে বসে বই লেখায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন।

সেই সাধনা তাঁর ফলপ্রসূ হয়ে উঠল। সেই ছেলেই ক্রমে বিখ্যাত তারাশঙ্কর হয়ে উঠলেন। সুধীরা তাঁকে সম্মান জানালেন। ভারতের বিখ্যাত সাহিত্য পুরস্কার জ্ঞানপীঠ তিনি লাভ করে বাঙ্গালীকে ধন্য করলেন।

তারাশঙ্করবাবু প্রায় এক বৎসরের অধিককাল বিগত হয়েছেন। কিন্তু চেষ্টার ফল কি হয় তার প্রমাণ তাঁর লেখা বইতে চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

"৺সুনির্মল ভাদুড়ী স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

তপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আবছা কুয়াশাজমা অন্ধকার। হনুমান চটীর নিরাপদ আশ্রয়ে সবাই যখন কম্বলের তলায় গভীরভাবে ঘুমো'চ্ছে ঠিক তেমনি সময়ে আমি আর আমার বন্ধু অসিত দুজনে মিলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। জায়গাটা উত্তর কাশী থেকে উনত্রিশ মাইল উত্তরে। ছোট্ট একটা গ্রাম। তেরো হাজার ফুট উপরে মহাঋষির মত ধ্যান গম্ভীর এই গ্রামটার নাম কুট্। সময়টা ঠিক সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। বেশ পুরু বরফ জমে আছে সর্বত্র। তবে তাতে বাধা সৃষ্টি হয় নি আমাদের।

আমরা ওভারকোটের ওপর কম্বল চাপিয়ে, মাথায় মোটা গরম চাদর জড়িয়ে, হাতে চামড়ার দস্তানা পরে, পায়ের ওপর দেশী কম্বলের মোজা চাপিয়ে তার ওপর হীল-তোলা মোটা চামড়ার জুতো পরে শীতকে আটকে রাখার বৃথা চেষ্টা করছি। সামনে ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের বিচিত্র রূপ, একটা অদ্ভুত ভাব মনটাকে কেমন একরকম আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে যে কী সুন্দর! কল্পনাও করা যায় না। যারা হিমালয়ের সে রূপ দেখেনি তারা বুঝবে না, আর যারা দেখেছে তাদের সে হাতছানি দিয়েছে বারংবার। হিমালয়ের এই বিরাটত্ব উপভোগ করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম।

আসলে আমরা চটী থেকে কিছুটা উপরে একটা পাহাড়ী পথে ঘুরছিলাম। কতকগুলো তীর্থ দেখতে এসেছিলাম। পাহাড়ী পথে ধস নামায় ঐখানে ঐ চটীতে দেড়দিন আটকে পড়েছিলাম। কিন্তু তা হলেও দুটো তাজা প্রাণ কখনও ঐরকম জায়গায় আলস্যে সময় কাটাতে পারে না। তাই অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় আমরা দুই বন্ধু আত্মীয় পরিজনের বারণ সত্ত্বেও ওই ভোরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। পথের ওপর জায়গাটা এমনিতে নিস্তব্ধ, কিন্তু কিছু দূরে গঙ্গানদী উজ্জ্বলভাবে বয়ে গেছে ঝরনার মত। একটা গুমগুম শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে ঘা খেয়ে উঠে আসছিল। শব্দটার এমন একটা গুরু-গম্ভীরভাবে এগিয়ে আসার ধরন, যা শুনে মনে হচ্ছিল যেন কোনো মহাযোগী অন্তহীন ওংকার ধ্বনি করতে করতে এগিয়ে আসছেন।

হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল হলো যখন চটী থেকে গোটা দুই মাইলস্টোন ছাড়িয়ে এসেছি। অসিত ঠাণ্ডায় আর পরিশ্রমে হাঁফাচ্ছিল, বলল, "তপন, চল বসি একটু, অনেক দূর চলে এসেছি, এবার ফিরব।" আমিও খুব দুর্বল বোধ করছিলাম। আমার ডান পাটা কাঁপছিল অল্প অল্প। বিনা বাক্যব্যয়ে ধুপ্ করে বসে পড়লাম একটা

ওর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। [পৃষ্ঠা ৮৩৫

পাথরের চাঙড়ের ওপর। আমাদের ডানদিকে উঁচু পাহাড়টার চূড়া। বাঁ দিকে ঢালু পাহাড় নেমে গেছে আর কিছু দূরেই কুয়াশার পর্দায় ঢাকা পড়েছে। সেই সকালে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘন কুয়াশা একটা বিশ্রী কালো বাদুড়ের মত নেমে আসতে লাগল। পথঘাট সব যাচ্ছে ঢেকে। যদিও আমাদের পথ ভুল হবার কোনও কারণ নেই, কারণ আমরা পাহাড়ে কাটা পথ ধরেই এসেছি। তা হলেও মিনিট পনেরো বসার পরেই আমি আর অসিত উঠে দাঁড়ালাম। তারপর ফেরবার রাস্তা ধরলাম গুটিগুটি পায়ে। সামনে অসিত আর আমি তার পিছনে। তার বুটের একঘেয়ে শব্দ শোনা যাচ্ছে···পথ যেন আর শেষই হতে চাইছে না···

হঠাৎ বুকের ভেতর দিয়ে রক্তের স্রোতে যেন হিমপ্রবাহ বয়ে গেল, কোথায় অসিত? ওর পায়ের শব্দ কই আর শোনা যাচ্ছে না! সমস্ত ঘটনাটা অস্পষ্ট উপলব্ধি করেই আমার বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়ে গেল! শুনেছিলাম, পাহাড়ে পথ হারানো নাকি ভংকর। এখানে মানুষ নেই, নেই গাছপালা। চিরতুষার একটা সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরবে আমাকে। আমি হয়তো···হয়তো আর ফিরে যেতে পারবো না। ভয়ে হতাশার মধ্যে দিশেহারা পাগলের মত চেঁচিয়ে ডাকলাম, "অসিত!"

নিজের গলার আওয়াজে নিজেই চমকে উঠলাম। শব্দটার প্রতিধ্বনি আমাকে যেন ব্যঙ্গ করে উঠলো। ডান দিকের পাটা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। থামাতে চাইলাম জোর করে। পারলাম না। একটা অদ্ভুত ভয়, শিহরন ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করছিল। পায়ের তলায় পথের রেখা আর খুঁজে পাচ্ছি না। এই তুষাররাজ্যে কোথায় হারিয়ে গেলাম বুঝতে পারছি না। ঘন কুয়াশা চাপ চাপ হয়ে জমা রক্তের মত আমার চারিদিকে ঘেরাটোপ রচনা করেছিল। দৃষ্টি চলে না দুহাত দূরে। কোথায় সেই হনুমান চটী? ভয়ানক ভয়, দুর্বলতা, হতাশায় আমি বসে পড়তে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ

একটা শব্দ শুনতে পেলাম। ও কিসের শব্দ? কারো পায়ের শব্দ? ওকি মানুষ? না অন্য কিছু? তবু···তবু ঐ ওকেই ডাকতে হবে। মনের সমস্ত শক্তি জড় করে চিৎকার করে ডাকলাম; "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!"

ক্লান্ত অবসন্ন মস্তিষ্কে বুঝতে পারলাম আওয়াজটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে! আসছে!! কুয়াশার মধ্যেই অস্পষ্ট তার রূপ দেখা গেল। ও কে? কে? "কাঁহা হায় বাবুজি?" ব্যাকুল একটা স্বর শুনতে পেলাম। আঃ! মানুষ! ও মানুষ! আমি কি নরক থেকে স্বর্গে চলে গেলাম? ওই কর্কশ হিন্দুস্থানী কণ্ঠস্বর কানে যেন ঝংকার তুললো। মানুষের গলার স্বর কি এত সুন্দর এতই মধুর? কল্পনাও করতে পারিনি। কত গান তো শুনেছি। কই এমন মধুর ধ্বনি তো আগে শুনিনি কোনও দিন! "বাবুজি", লোকটা দেখতে পেয়েছে আমাকে "রাস্তে কে কিনারে খাড়া হ্যায় কিঁউ বাবুজি?" লোকটা একটা নেপালী পুলিস। "আপ কাঁহা জায়গা বাবুজি? হনুমান চটী পর? ম্যঁয় ভি তো উহাই যা রহা হুঁ।"

আমার উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না। ওর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর চিরতুষারের রাজ্যে কুয়াশার পর্দা পড়ে নাটকের যবনিকা পতন হল। আমি উপলব্ধি করলুম মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু কেবল মানুষই হতে পারে। তারপর পথ চলতে চলতে অনেক বন্ধুই তো পেয়েছি। ওই সরল নেপালী লোকটার মুখটা গেছি ভুলে। তবু কই? তার প্রতি কৃতজ্ঞতা তো ভুলে যেতে পারিনি?

নীচু নজর　　　　নাইনটি পারসেণ্ট

রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নীচু নজর

চাকর—আমি বাবু আপনার বাড়ি আর কাজ করছিনে।

মনিব—কেন রে?

চাকর—আপনার বড় নীচু মন।

মনিব—(সহাস্যে) কেন—কি করলাম?

চাকর—আপনি কাউকে বিশ্বাস করেন না —ক্যাশবাক্সের চাবিটা পর্যন্ত লুকিয়ে রাখেন।

নাইনটি পারসেণ্ট

ক্রেতা—তোমার টক আম আড়াই টাকা কেজি।

আম বিক্রেতা—বাবু, সেণ্ট পারসেণ্ট টক তেঁতুল দু টাকা কেজি কিনছেন, আর আমার আম নাইনটি পারসেণ্ট টক, তার দাম আড়াই টাকা হবে না—কি যে কন?

"৺সুনির্মল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

উনিশ আট বাহাত্তর

সুভাষ বৈদ্য

দিনটি হল উনিশ আট বাহাত্তর। শনিবার। আমাদের Higher secondary পরীক্ষার ফলাফল বেরুবে। সকাল থেকে কি হবে, কি হবে ধরনের একটা ভয় মনের মধ্যে ঘুরছে। বাড়িতে বসে আছি। বসে বসে নানান্ জল্পনা কল্পনা করছি। এই ফলাফলের উপরে আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। যদি ভালোভাবে পাস করতে পারি তবেই আমার কলকাতায় পড়াশুনা করার সুবিধা হবে এবং কালকে ভোরের ট্রেনেই কলকাতা। আর কলকাতা গিয়েই জীবনের প্রথম interview দেবো। আর ফেল করলে চারিদিক অন্ধকার। হয়তো আবার আসছে বছর পরীক্ষা দেবো। কিন্তু এই পরিবেশ হয়তো তখন আর থাকবে না। বন্ধুবান্ধব সবাই একবছর এগিয়ে যাবে। ঠিক এইরকম সময়ে 'খোকন খোকন' বলে আমার নাম ধরে ডাক শুনতে পেলুম। আমার বন্ধু প্রভাত আমাকে ডাকছে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি পঞ্চপাণ্ডবের চারজন অর্থাৎ আমার বন্ধু চতুষ্টয় আমাকে ডাকছে।

—কি করছিস ঘরে বসে। চলে আয়। ঘুরে আসি চল। তারা বলল।

আমি বললাম, আজকে আর বেড়াতে যাবো না।

ওরা চলে গেল। বলে গেল, ফলাফলের খাতা দুপুর দুটো নাগাদ আসবে আর সেই সময় আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে আমাদের ফলাফল জানতে যাবো।

ঠিক আছে বলে আমি চলে এলাম।

স্নান করে খেয়ে উঠে খবরের কাগজটা মুখে তুলেছি এমন সময় ওরা সবাই মিলে আবার ডাকতে এলো। আমি তাড়াতাড়ি খবরের কাগজ শেষ করে জামা প্যাণ্ট পরে ওদের সঙ্গে গেলাম "বুক কর্নার"। এই দোকানেই ফলাফলের খাতা আসার কথা। কিন্তু দোকানের কাছে গিয়েই আমার পিলে চমকে উঠলো। বাপরে বাপ কি ভিড়। আর কি হইচই। তখনই বুঝলাম ফলাফলের বই এসে গেছে। ব্যাস বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠলো। মনে হল নির্ঘাত কুসংবাদ শুনতে হবে। আগেই বলে রাখি যে আমরা হতাশ হয়ে পড়ার আগে মনটাকে তাজা করার জন্যে ভেবে নিলুম, আমি যদি হড়কাই তাহলে স্কুলের যারা আমার নীচে নম্বর পায় তারাও লাড্ডু পাবে। অতএব এত ভয় না পেলেও হবে। তাছাড়া আমরা পঞ্চ পাণ্ডব ছাত্র হিসাবে তো খারাপ নই। মাস্টারমশাইয়ের ধারণা আমরা সবাই ভালভাবে পাস করব।

সামনে দাঁড়িয়ে প্রভাতের মা কাঁদছেন। [পৃষ্ঠা ৮৩৮

আমাদের এই পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে হিমু আর প্রভাতই সবচেয়ে বেশী হাসিখুশী। সবসময়ই শুধু হাসে আর বাকী তিন জনকে হাসায়। কিন্তু ফল জানার পূর্বমুহূর্তে হিমুর হাসিমুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু প্রভাত বলে চলেছে—যা হবার তা তো হবেই। তুই এখন কিছু আর করতে পারবি? সুতরাং হাস। যত পারিস হেসে নে। বলেই সে নিজে হো-হো-হো হা হা-হা করে হেসে উঠলো। ওর হাসির ছোঁয়াচে আমাদেরও হাসিরোগে পেল। কিন্তু ভাল করে হাসতে পারলাম না। ভয়ভূতটা আমাদের ঘাড়ে বসে আমাদের ঠোঁট দুটো বেশী ফাঁক হতে দিলে না।

সে যাহোক একটা কাগজে আমরা আমাদের Roll No. লিখে ভিড় ঠেলে "বুক কনারের" বিরাট গহ্বরে পাঠিয়ে দিলাম। ফেরত এলো একটু পরে। লিস্টে লেখা ফলাফল দেখার আগের মুহূর্তে আমার বুকে যেন কে একশো মন ওজনের একটা হাতুড়ি পিটছিল মনে হলো। ফলাফল দেখা মাত্রেই অদৃশ্য হাতুড়ির পিটুনী বন্ধ হল। আমি পাস। হিমু পাস। সবাই পাস। উঁহু, কই প্রভাতের নাম তো নেই। প্রভাত বেচারাই ফেল। মুখ ফিরিয়ে প্রভাতের দিকে তাকালুম। প্রভাতের মুখে হাসি লেগে থাকলেও হাসিতে কোন প্রাণ ছিল না। প্রভাত যদি কেঁদে ফেলতো তাহলে তাকে সান্ত্বনা দিতে পারতুম। কিন্তু প্রভাতের চোখের কোলে জল জমেছে। কান্নার চেয়ে করুণ হাসি দেখে আমার সব আনন্দ চলে গেল। মনে যেন গামছা নিংড়ানোর মত মোড়ে দিতে লাগল।

প্রভাত বললে, যা তোরা সবাই এবার থেকে ভালোভাবে পড়াশুনা কর। আমার আর না। অনেক হলো। এইবার বিশ্রাম।

এর একটু পরেই প্রভাত আমাদের চারজনকে ধরে কেঁদে ফেললো। জীবনে এই প্রথম ওকে কাঁদতে দেখলাম। ওর দুঃখে সত্যি আমরা সবাই মুষড়ে পড়লাম। ও বললে—এ মুখ আর বাড়িতে দেখাবো কি করে? তখন আমরা সবাই মিলে ওকে ওর বাড়িতে রেখে এলাম।

এই ঘটনার পর থেকে শুধুই মনে হতে লাগলো প্রভাত বেচারা ভীষণ দুঃখ পেয়েছে ও বোধহয় আমাদের সঙ্গে আর বেড়াবে না। পরদিন ভোর ৪টা ৪২শে ট্রেন। ৪-২০তে আমি স্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম। এসেই দেখি প্রভাত আমার জন্য আগে থেকে স্টেশনে অপেক্ষা করছে। আমি আশ্চর্য হলাম। ও বললো, তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না কিনা, তাই দেখা করতে এলাম। মনে হল বহুদিন কলকাতায় থাকতে হবে। সম্প্রতি দেখা হবার সম্ভাবনা নেই বলে প্রভাত আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তাই বললাম—দূর পাগল, আমি কি একেবারে যাচ্ছি নাকি। যদি পড়ি বা চাকরি পাই তাহলে কি আমি আর ফিরবো না।

ট্রেন এমন সময়ে এসে গেল, কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে গল্প করলাম। ওকে বোঝালাম যে এবার তোকে খুব ভালোভাবে পাস করতে হবে। যাতে ডাক্তারি পড়তে পাস। এরপর আমিও ট্রেনে উঠলাম। উঠে বসবার জায়গার ব্যবস্থা করে দেখি প্রভাত নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলাম, কিন্তু কোন ফল হলো না। ভাবলাম প্রভাত হয়তো ফিরে গেছে।

ট্রেন ছাড়লো। সবে প্ল্যাটফরম ছাড়িয়েছে এমন সময় শুনি হৈ-হল্লা। আর গাড়িও থেমে গেলো। শুনলাম কে নাকি গাড়িতে কাটা পড়েছে। ঐ "কাটা" কথাটা শোনামাত্র আমার বুকের ধুকধুকুনিটা খুব জোরে জোরে চলতে লাগলো। এই ধুকধুকুনির গতি বোধহয় প্লেনের গতিকেও ম্লান করে দেয়। মনে একটা অজানা আশঙ্কার উদয় হল। তবে কি ?

ট্রেন থেকে নেমে এগোচ্ছি সেই কাটা পড়া লোকটির দিকে। পথে অনেককে জিজ্ঞেস করলাম কেউ চেনে কিনা। সবারই উত্তর "না"। কিছুটা আশ্বস্ত হলুম। এসে গেছি। ভিড়ের মধ্যে ঢুকবো কি ঢুকবো না করে ঢুকলাম। ঢুকেই প্র···ভা···ত বলে চেঁচিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। একটু পরেই জ্ঞান ফিরে দেখলাম ট্রেন আমার স্যুটকেশটা নিয়ে চলে গেছে। আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রভাতের মা কাঁদছেন। ওর বাবা চুপ। নিস্তব্ধ নিথর হয়ে তাঁর আদরের ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। এবার ভালো করে দেখলাম প্রভাতের দেহটা। মাথাটা একদিকে অক্ষত হয়ে পড়ে আছে। আর দেহটা একদিকে একতাল মাংসপিণ্ডের মত দেখাচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ বাদে আমাদের বন্ধুরা সবাই এলো। অনেক কসরতের পর প্রভাতের দেহের সৎকার হলো। তারপর হতাশা, বিস্বাদ, ভয়, বেদনা আর কান্না নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

এখন বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে আবার আমরা একসঙ্গে বেড়াই। আমাদের পঞ্চ পাণ্ডবের একজন আর নেই। হিমুর সেই সর্বনাশা হাসি আর আনন্দ গাম্ভীর্যে পরিণত হয়েছে। আমরাও হাসি না। আমি নিজে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সেই দুঃখের স্মরণীয় উনিশ আট বাহাত্তর যেন আর ফিরে না আসে! কিন্তু হায় সে আসবেই। সে থাকবেই। সে বেদনাভরা হবেই।

মজার পাতা

নতুন ধাঁধা

১। একটি ঘরে দুই বন্ধু বাস করত। দুজনেই অফিসে চাকরি করত। প্রথম বন্ধু কাজে বেরুত বেলা ৯টায় এবং ফিরত বৈকাল ৪টায়। আর দ্বিতীয় বন্ধু বেরুত বেলা ১০টায় এবং ফিরত ৫টায়। তাদের অনুপস্থিতিকালে দরজায় তালা লাগান থাকত। চাবি মাত্র একটি। এখন তোমরা কি বলতে পার, কোন্ বন্ধুর নিকট চাবি থাকলে তাদের অফিসে যাওয়া ও বাড়ি ফেরার কোন অসুবিধা হবে না?

২। 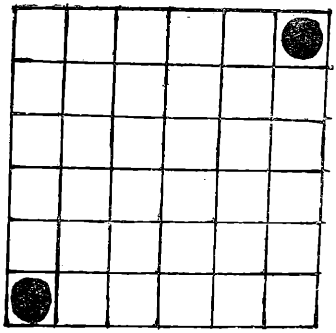

ছত্রিশটা ঘর কাটা একটা ছক আছে। ছকের দু'কোণে দুটি ঘুটি আছে। ঐ ঘুটি দুটিকে না সরিয়ে ঐ ঘুটি দুটি সমেত মোট ১২টি ঘুটি এমন ভাবে ছকের মধ্যে সাজাতে হবে, যাতে ছকের প্রতিটি পাশাপাশি ও ওপর-নীচের লাইনে এবং কোনাকুনি ভাবে ধরলে ২টির বেশী ঘুটি থাকবে না। চেষ্টা করে দেখ তো পার কিনা। সাদা কাগজে ছক এঁকে উত্তর পাঠাবে।

গত কার্তিক সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১।

১	১১	৬	১৬
৮	১৪	৩	৯
১৫	৫	১২	২
১০	৪	১৩	৭

২। ভুলিঠাকুরই চোর। ১ম কারণ—বেয়ারা দাসু যদি টাকা চুরি করত, তাহলে ভুলিঠাকুর এসে টাকা দেখতে পেত না। ২য় কারণ—৩৩ ও ৩৪ পৃষ্ঠা একই পাতার এপিঠ ওপিঠ—সুতরাং তার মধ্যে নোট থাকতে পারে না।

গত কার্তিক সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—মিনি ও খ্যাংড়াকাঠি—সত্যেন দত্ত রোড।

হাওড়া—কেক, পুডিং ও বুড়ি—বি. ই. কলেজ।

বীরভূম—সৌমিত্র, শিখা ও অনুরাধা ভৌমিক—দুবরাজপুর।

আসাম—বিশ্বজিৎ দেবরায় ও জিষ্ণু—পশ্চিম মাজিগাঁও।

KOLAY

FOR QUALITY **BISCUITS**

ORANGE CREAM

সর্বজন প্রশংসিত এবং বহুল প্রচারিত

সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত

সরল বাঙ্গালা অভিধান মূল্য ২৫·০০

ডাকমাসুল সহ টা. ৩০·০০ স্থলে টা. ২৫·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Century Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 12·00

Century Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs. 12·00

ডাকমাসুল সহ টা. ১৫·০০ স্থলে মাত্র টা. ১২·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Pocket Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 6·50

Pocket Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs. 6·50

ডাকমাসুল সহ টা. ৮·০০ স্থলে মাত্র টা. ৭·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

NEW BENGAL PRESS (Private) Ltd., 68, College Street, Calcutta 12

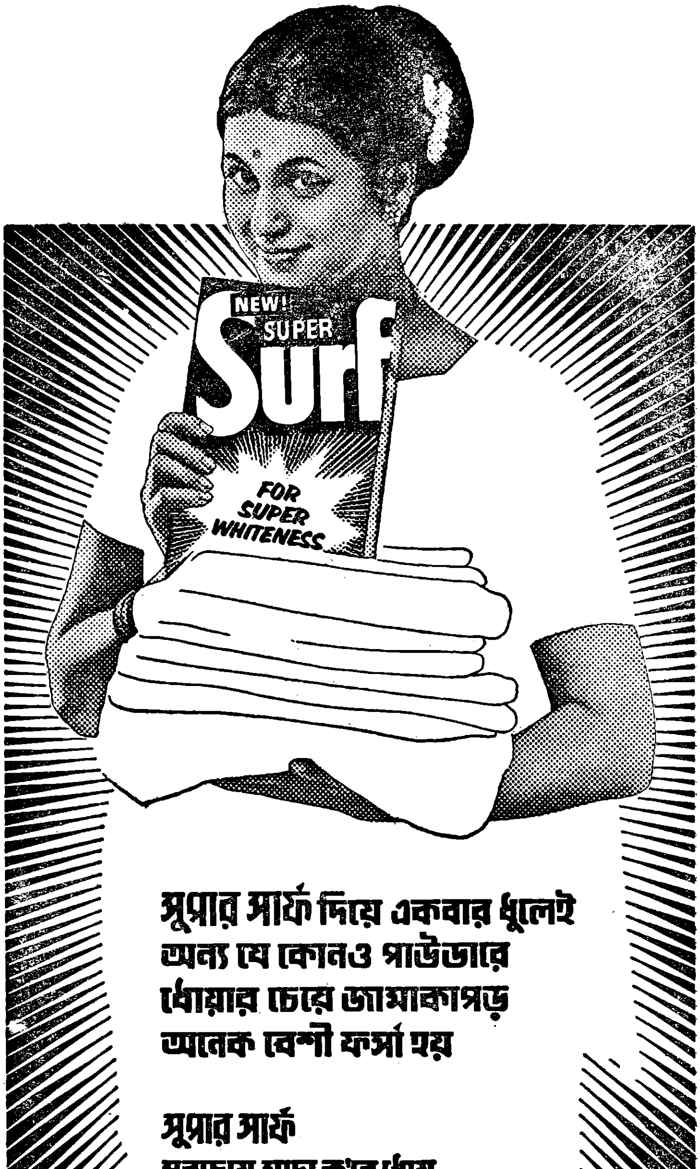

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SU.117-77 BG

পরিবারের সকলকে সবল ও সুস্থ রাখতে

ফসফোমিন

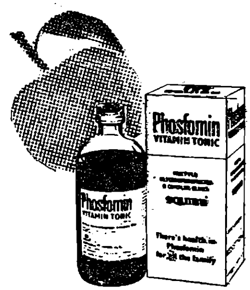

ভিটামিন বি কমপ্লেকস ও মালটিপল গ্লিসারোফ-সফেটস দিয়ে তৈরী ফসফোমিন আপনার পরিবারের সকলকে সবল, সতেজ ও সুস্থ রাখবার জন্যে একটি শক্তিশালী টনিক। ঘরে ফসফোমিন থাকলে ক্লান্তি ও অবসাদ বলে আর কিছু থাকবে না। ফসফোমিন শক্তি ফিরিয়ে আনে, ক্ষিদে বাড়ায়, কাজ করার ক্ষমতা যোগায়, আর শরীরের রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি বাড়ায়। পরিবারের সকলকে স্বাস্থ্যবান ক'রে তোলে।

ফসফোমিন—
ফলের গন্ধে ভরা সবুজ
রং'এর ভিটামিন টনিক

SQUIBB SARABHAI CHEMICALS

® ই. আর. স্কুইব এণ্ড সন্স
ইনকর্পোরেটেডের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক
ব্যবহারকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিনিধি
করমচাঁদ প্রেমচাঁদ প্রাইভেট লিমিটেড

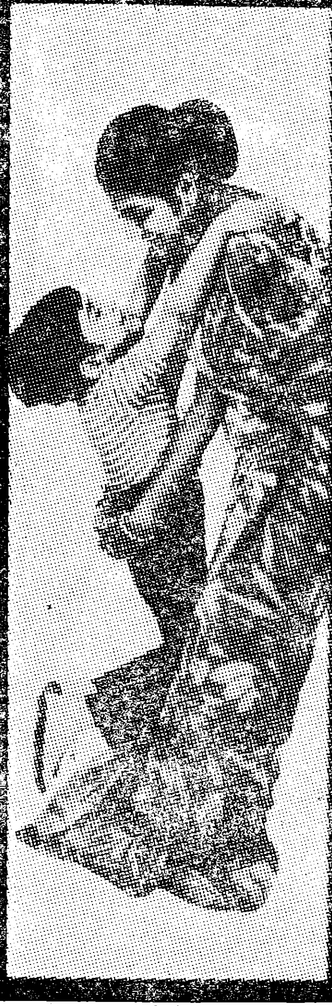

Shilpi HPMA-37A/72 Ben

AIYARS-C.165 BN

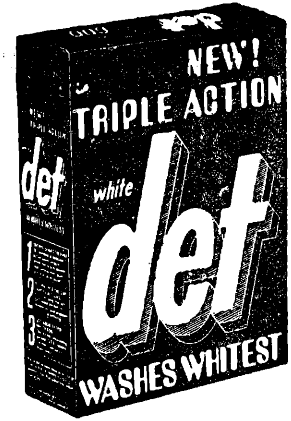

নতুন তিন ভাবে কার্যকর ডেট

- নতুন ডেট একটি খুব সাদা পাউডার··· যাতে রয়েছে সবচেয়ে সাদা ক'রে কাপড় ধোয়ার জন্যে একটি উৎকৃষ্ট পদার্থ।
- নতুন ডেটে রয়েছে সাদা করার বাড়তি শক্তি। এটি কাপড়ের পুরনো ময়লাও দুর ক'রে দেয় আর রঙীন কাপড় উজ্জ্বল ক'রে তোলে।
- নতুন ডেটে প্রচুর ফেনা হয় আর এই ফেনায় রয়েছে কাপড়-চোপড় নরম করার বিশেষ গুণ। এটি যেমন আপনার জামাকাপড়ের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ···তেমনি আপনার হাতের পক্ষেও সবচেয়ে নরম।

৫ টি নতুন সাইজে পাবেন : ডেট ২০০, ৪০০, ৬০০, ৮০০, ১০০০
তাছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে—নীল ডেট

Shilpi-HPMA 61F/71 Ben

আশুতোষ দেব প্রণীত

নবপর্যায় সংস্করণ

গণিতাংশের সমাধান সংবলিত

কিশলয়-বোধিকা

প্রথম ভাগ কিশলয়-বোধিকা (তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য)

দ্বিতীয় ভাগ কিশলয়-বোধিকা (চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য)

তৃতীয় ভাগ কিশলয়-বোধিকা (পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য)

Complete Key to

PEACOCK ENGLISH

Primer and Readers

Notes on

The Peacock English Primer
(for Class III)

The Peacock English Readers
Book I (for Class IV)

The Peacock English Readers
Book II (for Class V)

মধুসূদন দেব প্রণীত

ছাত্রসাথী
(তৃতীয় শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর)
মূল্য—৩.৫০

আধুনিক ছাত্র-সুহৃদ্
(চতুর্থ শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর)
মূল্য— ৫.০০

প্রশ্নোত্তরিকা
(পঞ্চম শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর)
মূল্য—৫.০০

দেব সাহিত্য কুটীর :: ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

Regd. No. C. 3063 "Suktara"

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এ বছরের নূতন বই !

● শিশু শ্রেণী ●

ঝুমঝুমি (অ আ)

শ্রীমধুসূদন দেব দাম— ১·২০

● প্রথম শ্রেণী ●

PICTURE PRIMER

By M. S. Dev Rs. 1·50

● দ্বিতীয় শ্রেণী ●

প্রশ্নোত্তরে পরিবেশ ও পরিজন

(ভূগোল-বিজ্ঞান)

শ্রীমধুসূদন দেব দাম— ১·৫০

● তৃতীয় শ্রেণী ●

PEACOCK ENGLISH GRAMMAR (III & IV)

By S. P. Dutta Rs. 1·50

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা-ভয় দূর করতে হাজির করা হলো

শ্রীশ্যামাপদ দত্তের

পরীক্ষা-সাথী—১ম ভাগ

(তৃতীয় শ্রেণী)

দাম— ৩·৫০

পরীক্ষা-সাথী—২য় ভাগ

(চতুর্থ শ্রেণী)

দাম— ৪·০০

● এক অভিনব পদ্ধতিতে লেখা

● বই দুখানিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর যাবতীয় পাঠ্যপুস্তকের যে কোন রকম প্রশ্নের উত্তর দেবার কৌশল হাতেকলমে দেখান হয়েছে।

● অধিকাংশ প্রশ্ন ছবির সাহায্যে সমাধান করে দেখান হয়েছে।

পি. সি. মজুমদার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

২৯।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯